আমার জীবন-কথা
কিছু ব'লে যাই

দুই

শ্রীঅভয়

প্রথম প্রকাশ : জুলাই, ১৯৪৯

প্রকাশিকা
শ্রীমতীআলোকিতা দেবী
(কল্পনা পাল চৌধুরী)
কীর্তন কুটির
বাঘাযতীন বাজার
রিজেন্ট এস্টেট
কলিকাতা-৭০০ ০৯২

মুদ্রাকর
শ্রীভারতী প্রেস
৮১/৩এ, রাজা এস. সি. মল্লিক রোড
কলিকাতা-৭০০০৪৭

ভূমিকা

আমার জীবন-কথা কিছু বলতে শুরু করেছিলাম। কিছুটা বলেছি। আরও কিছু কিছু আছে বাকি। সত্যি কথা বলতে কি এ সব কথা অনেক কথা। কতটা বলতে পারব জানি না। পারি না পারি ঈশ্বরের উপর নির্ভর করা আমার রীতি, আমার পন্থা। তাই ভাবছি এবং বলছি, তিনি যেমন করেন অথবা করান তেমনই হবে। তার বেশী হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই। কারণ নেই, উপায় নেই, কোনো দিক দিয়েই কিছু রাস্তা নেই।

এই দিক দিয়েও বটে, অন্য দিক দিয়েও বটে—সব দিক দিয়েই আটঘাট বাঁধা।

তবু আমার কিছু করবার আছে। আমার মনে একটা একান্ত ইচ্ছা আমার কথা আমি কিছু ব'লে যাব। ব'লে যাব মানে রেখে যাব। তাইতো এই বইটি লিখতে আরম্ভ করেছিলাম। প্রথম খণ্ড বেরিয়ে গেছে। দ্বিতীয় খণ্ডের লেখাটুকুও শেষ হয়ে গেছে। তবে নিঃশেষে শেষ হয়েছে কি? দ্বিতীয় খণ্ডের অংশটুকুকে লিখে, গুছিয়ে দাঁড় করাতে হচ্ছে। উপস্থিত মনে হয়, যেমন দাঁড়িয়েছে তাতেই চ'লে যাবে।

আবার ভাবি, যে-না লেখার ছিরি। তাই যেমন তেমন ক'রে লিখে চলেছি। একটা কথা মনে রাখতে হবে, এ সব স্থলে যা কিছু লিখি আমি নিজে লিখি না। আমি ব'লে যাই আর একজন কাগজে লিখে যায়। আমার লেখন, অন্যের অনুলেখন।

আমার মনের ভিতরে একটা ইচ্ছা কাজ ক'রে যায়—এই বইখানা যেন কয়েকটা খণ্ড পর্যন্ত পা বাড়াতে পারে। ভাবখানা এই, কিছুটা লিখে গেলুম বা রেখে গেলুম এটা যেন দেখে যেতে পারি। শেষ হোক বা না হোক।

প্রকাশিকার বলবার কথা

শ্রীঅভয়জীর লেখা একটি বই—'আমার জীবন-কথা কিছু ব'লে যাই।' বইটির দ্বিতীয় খণ্ড এইবার প্রকাশিত হচ্ছে। আমার দিক থেকে আমি এখানে জানাই, এই পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত করতে পেরে আমি আনন্দিত এবং ধন্য।

আমাদের ধারণা এই বইটির এক ঐতিহাসিক মূল্য রয়েছে। হয়তো সে কথা এককালে অনেকের সামনে অথবা সকলের সামনেই প্রকাশ পাবে। সে যা হোক আমি যেমন দেখতে পাচ্ছি অথবা বুঝতে পাচ্ছি তেমন কথাই এখানে বলতে সাহস পেয়েছি।

শুধু শ্রীঅভয়জীর কথা ব'লে নয় অন্য অনেক দিক বিবেচনা ক'রেও আমি সহজে অথবা স্বচ্ছন্দে এই সিদ্ধান্তেই উপস্থিত হ'তে পেরেছি।

তারপর? তারপরের কথা আমি কিছু বলতে পারি না। যেমন হবে তেমন সকলেই দেখতে পাবেন।

আমার কথার ভিতর দিয়ে আমার মনের ভাব অথবা ইচ্ছাই প্রকাশ পেয়েছে। সে তো বটেই। তবু আমি সুধী ব্যক্তিদের অনুরোধ জানাই, সবাই দেখবেন আমার এই সিদ্ধান্ত কেমন এবং কতদূর গিয়েছে। আমি যতদূর জানি, বুঝি এবং দেখতে পাই ততদূর পর্যন্তই আমার এখানে গতি। সেই দিক দিয়েই আমার সমর্পণ। শেষ কথা সেই একজনের হাতে।

পরিচ্ছেদ—১

দিল্লীর প্রসঙ্গ চলছিল। আমার প্রসঙ্গ ঠিক ধারাবাহিক নয়। কোনো কোনো স্থলে হয়তো আগেরটা পরে, পরেরটা আগে লেখা হয়েছে। তা হোক। আমি তাতে কিছু অসুবিধা বোধ করি না।

আমি যেন গল্প করছি। আপন ভাবে গল্প করছি। একটানা গল্প ক'রে চলেছি। যখন যেটা মনে আসছে ব'লে ফেলছি। কোন্ সময়ে কি হয়েছে সেই কথাও উল্লেখ ক'রে যাচ্ছি যেমন মনে পড়ে।

এবারে আমার জীবনের আর একটি জিনিস বলব। সেই জিনিসটির পুরো হিসেব দিতে পারব না। সেই জিনিসটি পুরোপুরি বলা একেবারে অসম্ভব। সেই জিনিসটি এতই গভীর এবং এতই বিশাল যে তার কথা আমি ব'লে কিছুতেই শেষ করতে পারব না। তবু আমি এখানে কিছুটা বলছি। যতটা পারি ততটা বলছি।

একদা আমার মনে এল, গীতার শ্লোক ধ'রে ধ'রে এমন ভাবে চলব যে, মানুষের মনে গীতার আশ্চর্য ছবি কিছু অংকিত হয়ে যাক।

আমার জীবনের মধ্যে অনুভূতির বা উপলব্ধির একটা দিক আছে। সত্য সেখানে তার নিজের ইচ্ছা অনুসারে আত্মপ্রকাশ করেছে। সত্যের কত না ছবি সেখানে ফুটে উঠেছে। কত বিচিত্র ছবি। কত সুন্দর ছবি। কত মধুর ছবি। কত অপরূপ ছবি।

সেই সব ছবি কোন্‌খান থেকে যে এসেছে তাও বলতে পারি না। সে সব ছবি বারে বারে ফুটে উঠেছে কখনো আমার কোনো একটা ভাবকে অবলম্বন ক'রে, আবার কখনো এমনি এমনি, আপনা আপনি।

আমার এই রকম মনে হয়, আমার সমস্তটাই এমনি এমনি অথবা আপনা আপনি। কে যেন কোথা থেকে কত কিছু ঢেলে দিচ্ছে। অথবা বলতে পারি, কে যেন আমার জীবনে ঘটনার পর ঘটনা ঘটিয়ে যা সম্পন্ন করবার তা সম্পন্ন করছে। এরকমও বলতে পারি, একটা অদৃশ্য

হস্ত সর্বদা আমার পিছনে থেকে সকল সময়ে আমাকে পরিচালিত করছে। কে একজন যেন প্রেরয়িতা আছেন যিনি আমাকে এবং আমার জীবনকে সকল সময়ে সঞ্জীবিত এবং সন্দীপিত ক'রে তুলছেন এক মহাজীবনের আলোকে।

কি বিচিত্র তাঁর কাজ! আমার অন্তরে অন্তরে সদাই তিনি তাঁর শক্তিতে এবং আলোতে তাঁর খেলা খেলছেন। কি যেন কি তিনি সংসাধিত করছেন। কি যেন ক'রে তুলবেন। কি যেন গ'ড়ে তুলবেন। আমার এই দেহ বুঝি তাঁর ল্যাবরেটরী। সেইখানে তিনি পরীক্ষা এবং নিরীক্ষা ক'রে কি যেন সমীক্ষা করছেন। কিছু একটা ক'রে তুলছেন এটা নিশ্চয়।

অনেকখানে তিনি অনেক কিছু কাণ্ড করেছেন এবং করছেন। আমার এই দেহরূপ আধারে তাঁর যেন একটা অভিনব কাণ্ড। আমি বুঝতে পারি, তাঁর এই কাণ্ড সাধারণ কাণ্ড নয়, অভিনব কাণ্ড।

তিনি যে অঘটন ঘটাতে পারেন। অলৌকিক জিনিসটা তাঁর জল ভাত। আসল কথা এই, তাঁর যেমন ইচ্ছা তেমন তিনি করেন। তাই আমার ভিতরে যেমন খুশি কাজে তিনি ব্যস্ত, যেমন ইচ্ছা লীলাতে তিনি লীলা পরায়ণ। যেমন তিনি তেমন—এইটিই হ'ল প্রকৃত কথা।

তাঁর স্বভাবটাই এখানে ধরা পড়ছে। তাঁর ধরনটাই এমন। তাঁর রীতিনীতিটাই এই রকম। কেন এমন ধারা কেউ জানে না। কেউ জানতে পারবেও না। কারোর পক্ষে জানা সম্ভব নয় যে। এই রকম তাঁর স্বভাব। এই রকমই। কি আর করা যাবে।

আমার কাহিনী বলছিলাম। আমার অন্তরে ভাব এল এই রকম, গীতার শ্লোক অবলম্বন ক'রে অথবা অন্য কোনো কথা অবলম্বন ক'রে আমার ভাবটি অন্যের অন্তরে বসিয়ে দেব।

এ রকম স্থলে প্রায়ই—প্রায় সবখানেই একাধিক ব্যক্তি নিয়ে—কয়েকজন নিয়ে অথবা অনেকজন নিয়ে আমাদের বৈঠক বসত। চক্রও বলতে পারি। পরমার্থ ভাবের মনন-চক্র অথবা ঈশ্বরের আলোচনায় মজ্জন-চক্র।

গীতাকে ধ'রে কাজ কিন্তু। গীতাকে অবলম্বন ক'রেই আমাদের এই নূতন রকমের সাধনা।

ক্বচিৎ কথনো শ্রীশ্রীচণ্ডী অবলম্বন ক'রেও আমরা এই পথে গিয়েছি। সেখানেও সেই আবৃত্তির পরে আবৃত্তি, জাগবার দিকে আগ্রহ, সত্যিকারের অনুভূতির আলোকে অবগাহন করবার প্রয়াস।

পূর্বেই বলেছি, গীতাই বেশী চলত। গীতার গানকে আমি 'আমার গান' ক'রে নিয়েছিলাম। তাই গীতার গানই গাইতাম। গীতার গান চিরকালই আমার প্রাণের গান। তবে একটা সময় গীতার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা বুঝি চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়েছিল। সেই সময়ে গীতার গান গাইতাম। শুধু গীতার কথা নয়, গীতার মঙ্গলাচরণের কথাও তার মধ্যে আছে। গীতার সূত্রে বসতাম। সেই সূত্রে কত গানই গাইতাম গীতার অনুস্মরণ সভাতে।

গীতার অনুস্মরণের কথা এবারে কিছু বলতে হয়। কয়েক বছরের ইতিহাস। সেই সময়টাতে গীতার অনুস্মরণ আমার জীবনে একটা আশ্চর্য স্থান নিয়েছিল। বছরের পর বছর আমার জীবনকে গীতার রসে অথবা ঈশ্বরের রসে অভিসিঞ্চিত ক'রে রেখেছিল কে যেন। কখনো কখনো এ রকম হ'ত গীতার সেই রস আমার অন্তরকে যেন জারিয়ে রাখত। জারক লেবু যেমন ভাবে জেরে যায় আমিও তেমন ভাবে জেরে যেতাম। গীতার রসে অথবা ভগবানের রসে অথবা হরিকথার রসে।

কখনো ঘণ্টার পরে ঘণ্টা গীতার গান চলত। গীতার গান চলত এও বলা যায়, গীতার কথা চলত এও বলা যায়। এমন একটা অবস্থা হয়েছিল গীতার ভাবে আমি যেন একেবারে সরাবোর হয়ে যেতাম। হিন্দীতে বলে সরাবোর।

গীতার গান। গীতার গান। গীতার গান। গীতার গান মানেই পরমার্থের গান। গীতার গান মানেই ঈশ্বরের প্রসঙ্গের গান। সত্যিকারের গান, সত্যিকারের কথা। প্রকৃত প্রসঙ্গ। জীবন-রহস্যের সহজ সমাধান। জীবনের অন্ধকার পথে চলবার এক আশ্চর্য আলোক।

গীতার অনুস্মরণ জিনিসটা প্রথম রূপ নিয়েছিল সেই নিউ দিল্লীতে— এই রকমই আমার মনে পড়ে। তখন থাকতাম নিউ দিল্লীতে বেয়ার্ড রোডে। সেই বাড়ী গভর্ণমেন্টের কোয়ার্টার। শরৎবাবুদের বাড়ী। আমাদের লীনার বাবা এই শরৎবাবু। বেয়ার্ড রোডে তাদের বাড়ীতে আমি কাটিয়েছিলাম কয়েকটি বছর। ক' বছর ঠিক মত আমার মনে নেই। দু এক বছরও হ'তে পারে, দু তিন বছরও হ'তে পারে। ওই রকমই একটা কিছু।

যে কথা হচ্ছিল। গীতার অনুস্মরণ একদা শুরু হ'ল। একটা দিনের কথা আমার বেশ মনে আছে। লীনার বোন জেনুর শ্বশুর— শ্রীহরিদাস গুপ্ত তখন নিউ দিল্লীতে। ওই বাড়ীতেই আছেন। আমাদের গীতার অনুস্মরণ শুরু হয়ে গেল শেষ রাত্রিতে। আমার মনে পড়ছে, পাঁচটি ঘণ্টা ধ'রে সেই অনুস্মরণ অথবা গীতার গান চলল। হরিদাসবাবুর পাশের এক ঘরে। তাঁর কথাটা বিশেষ ক'রে বলছি এই কারণে— তিনি ঠিক সামান্য অথবা সাধারণ লোক নহেন। আচার্য বিজয়কৃষ্ণ ঠাকুরের তিনি যে শিষ্য। ব্রহ্মর্ষি সত্যদেবের তিনি যে গুরুভ্রাতা। তাই তাঁর কথা বিশেষ ক'রে মনে পড়ে।

এই রকম ভাবে গীতার অনুস্মরণ আমাদের চলতে থাকল মাঝে মাঝে। নিউ দিল্লীতে আর কখনও হয়েছে কি হয়নি ঠিক মত বলতে পারব না। একটু একটু মনে পড়ে, নিউ দিল্লীতে আরও এক আধবার হয়েছে। তবে কলিকাতায় মহেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে অনেক অনেক বার হয়েছে— সে-কথা আমার অন্তরে সোনার অক্ষরে লেখা আছে।

পরিচ্ছেদ—২

এবারে কলিকাতায় গীতার অনুস্মরণের কথা কিছু কিছু বলি। মহেন্দ্রবাবুর বাড়ী। সপ্তাহে একটা দিন অথবা দুটো দিন গীতার অনুস্মরণ হয়। চলছে সেই রাঙা মায়ের বাড়ী থেকে। রাঙা মায়ের বাড়ীতে ছোট্ট ঘরে গীতার অনুস্মরণ হ'ত। সপ্তাহে এক আধ দিন। মহেন্দ্রবাবু সেন্ট্রাল পার্ক থেকে অনেক সময়ে শেষ রাত্রে উঠে হেঁটেই চ'লে যেতেন। গীতার অনুস্মরণের নেশা তাঁকে যেন পেয়ে বসেছিল। একদিন অনুস্মরণে আমাদের সভায় ব'সে তিনি দেখতে পেলেন এক অপরূপ দর্শন। আমার পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন কৃষ্ণ। জেগে ব'সে দেখতে পেলেন। আরও কত কী দেখেছেন তিনি। একবার নাকি বাজারে গিয়ে দেখতে পেলেন— সকল বিক্রেতার স্থলেই শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং।

এবারে আসি সেন্ট্রাল পার্কে। মহেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে আছি। ওই বাড়ীতে নিত্য কথা-কীর্তন, প্রসঙ্গ, আলোচনা— সমস্তই ঈশ্বরের। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর। কিন্তু এইখানে খুব একটা আশ্চর্য এবং খুব একটা সুন্দর জিনিস অনুষ্ঠিত হ'ত, সেটা –গীতার অনুস্মরণ। কখনও আমরা সংক্ষেপে ব'লে থাকি গীতানুস্মরণ।

মহেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে গীতার অনুস্মরণের সভা ব'সত ভোরের দিকে। এই সভা প্রায়ই ব'সত ভোরের দিকে। সকলকে বলতাম, তোমরা চান টান ক'রে তৈরি হয়ে এসো। সবাই একটি ক'রে আসন নিয়ে গীতার সেই সভাতে ব'সত। কারও কারও কাছে হয়তো থাকতো কিছু ফুল।

আমি প্রায়ই লেবু চা ইত্যাদি খেয়ে গীতার অনুস্মরণে বসতাম। একটি কম্বল ভাঁজ ক'রে পাতা। তার উপরে ব'সে আছি। আমার সামনে আমার সেই ছোট্ট হারমোনিয়ম। ফুলটুলও কিছু আছে।

বেশ মনে আছে, বেশীর ভাগ দিনই বসবার সঙ্গে সঙ্গে মনটা একটা ভাবের জগতে চ'লে যেত। প্রথম দিকে গুরু-বন্দনা। 'ভবসাগর তারণ

কারণ হে' — এই গানটি। বেশ মনে পড়ে, গানটি শুরু হওয়ার পরেই আমার চোখের থেকে নামতো জলের ধারা।

নিজের কথা নিজে বলছি। আমার কথাটা আমিই ভাল বলতে পারব বোধহয়। আমার কথা অন্যে বললে, তেমন ভাবে বলা হবে না। তাই নিজের কথা নিজেই বলছি।

আজ পর্যন্ত নিজের কথা এরকম ভাবে কেউ বলেছে কি না জানি না। হয়তো বা বলেনি। তবু আমি নিজের কথা নিজে ব'লে চললুম।

গীতার অনুস্মরণে বসবার সঙ্গে সঙ্গে আমি যেন কোথায় তলিয়ে গেছি। গানের পর গান চলেছে। প্রায় সমস্ত গানই আমি গাইছি। একটু একটু কথা বলছি আর গান গাইছি।

ক্রমে আসছে গীতার মঙ্গলাচরণ। মঙ্গলাচরণটি গীতার অন্তর্গত বিষয় নয়, তবু তো গীতারই মঙ্গলাচরণ। মঙ্গলাচরণের ধারা বেয়ে গীতার জগতে প্রবেশ। মঙ্গলাচরণ সম্পূর্ণ করতেই লেগে যেত অনেকখানি সময়। গীতার সুরে সুর মিলিয়ে, শ্রীকৃষ্ণের ভাবনার স্রোতে গা ভাসিয়ে, আমি চ'লে যেতাম অনেক অনেক দূর।

ওরই মধ্যে এই কথা এল—

প্রপন্নপারিজাতায় তোত্রবেত্রৈকপাণয়ে।
জ্ঞানমুদ্রায় কৃষ্ণায় গীতামৃতদুহে নমঃ ॥

বারে বারে চলতে লাগল, এই শ্লোকটির আবৃত্তি। কত কত বার। আমরা তখন ভাবের তরঙ্গে ভেসে চলেছি। আমি একা নয়, আমরা সকলেই। ভেসে কোথায় যেন চ'লে যাচ্ছি। কৃষ্ণেরই কথা। গীতার বক্তা কৃষ্ণ, সেই কৃষ্ণেরই কথা।

এইভাবে গীতার মঙ্গলাচরণের পর শুরু হ'ত গীতার প্রসঙ্গ। গীতার থেকে দুটো চারটে শ্লোক পড়ছি অথবা আবৃত্তি করছি। গীতার গানে গানে এবার চলেছি গীতার তরী বেয়ে।

. গীতার তরী অথবা তরণী আমাদের নিয়ে চলেছে অন্য এক রাজ্যে। গীতার ধারা ধ'রে আমরা চলেছি আর চলেছি। গীতার নায়ক ভগবান

শ্রীকৃষ্ণ আমাদের সঙ্গী। গীতার গান গাইতে গাইতে, গীতার কথা কইতে কইতে আমরা চ'লে গিয়েছি কোথায়, কোন্‌খানে। সুরে এবং ধ্বনিতে ভর ক'রে আমরা পৌঁছে গিয়েছি কোথায় কে জানে।

তখন আমাদের জগৎ গীতার জগৎ। আমরা কি ডুব দিয়েছি না ভেসে গিয়েছি! আমরা কি এখানে অন্তর্মুখ না বহির্মুখ। অন্তর এবং বাহির দুটোই এখানে কাজ করছে সমান তালে। সমান তালে সমান্তরালে। যেন দুটো Parallel straight line.

আবার বলি, গীতার অনুস্মরণ আমাদের কাছে একটি বিচিত্র ভাবনা। বিচিত্র ভাবনা নয়, বিচিত্র সাধনা। সত্যি কথা বলতে কি, বিচিত্র উপাসনা। বিচিত্র অর্চনা'ও বটে। সব মিলিয়ে আমাদের সেই জগৎ এক বিচিত্র জগৎ। বিচিত্র অনুভূতির জগৎ। কলিকাতায় এই জিনিসের বিশেষ বিকাশ ঘটেছিল সেণ্ট্রাল পার্কে মহেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে।

মহেন্দ্রবাবুর কথা কি আর বলব। তিনি তাঁর ভাবের জগতে ভাবের সাগরে যেন সাঁতার কাটতেন। আমাদের এই গীতার অনুস্মরণের সভাতে যে-কেউ যোগ দিত, তার অন্তরে কম বেশী ওই রকমের অবস্থাই হ'ত।

পাশের থেকে এক মহিলা আসতেন—কাশীর হরিহর বাবার শিষ্যা। আরও কত কেউ আসতেন। ইচ্ছা মা আসতেন সামান্য দূর থেকে। যিনিই আসতেন তিনিই যেন ম'জে যেতেন। গীতার ডাক অথবা গীতার ভাবনা প্রত্যেককেই চঞ্চল অথবা বিহ্বল ক'রে দিত।

গীতার অনুস্মরণ হয়েছে কত কত স্থানে। প্রথম দিকে ফার্ণ রোডে কালীর কারখানাতেও হয়েছে। সব জায়গায় একরকম হয়েছে তা নয়। যখন যেখানে যেমন, তখন সেখানে তেমন। একডালিয়া রোডে মাতা আনন্দময়ীর আশ্রমে গীতার অনুস্মরণও হয়েছে, চণ্ডীর অনুস্মরণও হয়েছে। প্রায় প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানেই আনন্দের স্রোত বইত।

দোগাছি গ্রামে অনেকবার গিয়েছি। সেখানেও এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ'ত মাঝে মাঝে। গ্রাম দেশের সহজ মানুষেরা এই অনুষ্ঠানটি পেলে একেবারে ডুবে কিংবা ভেসে যেতেন।

শুধু দোগাছি গ্রামে কেন অন্য স্থানেও হয়েছে—শহর থেকে বহুদূরে নিতান্ত গ্রামাঞ্চলে। গ্রামাঞ্চলেও হয়েছে, অন্য অঞ্চলেও হয়েছে। শান্তিনিকেতনের শান্ত আবহাওয়াতে এই অনুষ্ঠানটি এক অপরূপ রূপ নিত। আবার কোডারমা অঞ্চলে শিবসাগর নামক পাহাড়িয়া ভূমিতে হয়েছে এই ধ্যান অথবা অনুষ্ঠান। যেখানে যেখানেই হ'ত সেখানে সেখানেই প্রায় আনন্দের বান ডাকত। অথবা ভাবের জোয়ার বইত। সেই জোয়ারের জলে ভাসত শুধু একজন নয়—অনেকজন।

এইরকম আনন্দে ভেসে ভেসে অথবা অবগাহন ক'রে ক'রে আমরা কোথায় যেন চ'লে যাচ্ছিলাম। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা অন্যরকম। ভগবান আর কিছু চান। একটা কথা আছে - এ্যায়সা দিন নেহীঁ রহেগা। অর্থাৎ কিনা এরকম দিন থাকবে না। আমার জীবনেও তাই হয়েছে।

পরিচ্ছেদ—৩

পট পরিবর্তন হ'ল। ভাসতে ভাসতে কোথায় যেন চ'লে গেলুম। কলিকাতার বাইবে বারাণসীতে কিছুকাল কাটল আমার। বারাণসীতে গিয়ে প্রথমটায় আমি রইলাম অসীঘাটে হরিহর বিশ্বনাথ আশ্রমে। অসীঘাট থেকে উঠেই একটা গলিতে এই আশ্রম। বিশ্বনাথবাবার শিষ্য শ্রীযুক্ত দীনেশ গাঙ্গুলী এবং শ্রীমতী কামনা গাঙ্গুলী প্রভৃতির উৎসাহে এবং উদ্যোগে এই আশ্রম প্রতিষ্ঠিত। সেবার আমি কাশীতে গিয়ে এইখানেই ডেরাডাণ্ডা পাতলাম।

হুজুগের ভিতর দিয়ে কয়েকদিন কেটে গেল। কাশীতে আগে অনেকবার এসেছি। এবারেও এসেছি।

কাশী যে আমার অত্যন্ত প্রিয় স্থান। কাশী বোধহয় আমার বরাবরই প্রিয়। আমাদের সমাজের আত্মীয়-স্বজন বহু সংখ্যায় বহু কাল

ধ'রে কাশীতে বসবাস ক'রে আসছেন। আমিও পূর্বে বহুবার কাশীতে এসেছি, একথা আগেই বলা হয়েছে।

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর কাছে থাকবার কালে কাশীতে এসে আমি খুব আনন্দেই দিন কাটিয়েছি। শ্রীগোপীনাথ কবিরাজের সঙ্গ আমাকে যেন নেশাগ্রস্ত ক'রে রাখত। মনে পড়ছে সে একবার নয়, কত কত বার গোপীনাথজীর কাছে গিয়েছি। সেই প্রথম যুগেও তাই, মধ্যযুগেও তাই, পরবর্তী জীবনেও তাই।

শেষের দিকে শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ থাকতেন শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর আশ্রমে ভদৈনিতে। আমি আমার জীবনের খুব বিচিত্র একটা সময় কাটিয়ে দিয়েছি শ্রীগোপীনাথ কবিরাজের সঙ্গে। আর কোথাও নয়, শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর আশ্রমে।

আমার প্রত্যেক দিনের কাজ ছিল, গোপীনাথবাবুর ঘরে গিয়ে তাঁকে গান শোনানো। কানে তিনি কম শুনতেন। তাই তাঁর কানের কাছে মুখ নিয়ে আমি উচ্চস্বরে গান ধরতাম।

তিনি চৌকিতে ব'সে আছেন, আমি দাঁড়িয়ে গান গাইছি। বেশীর ভাগ গাইতাম আমার নিজের রচনা গান। কচিৎ কখনও অন্যের গানও গাইতাম। কবিরাজ মশাই আমার গান শুনতেন নীরবে, শান্তভাবে, একমনে।

একদিন গাইলাম এই গানটি, আর কত দিন আছে বাকী। গানটি শুনে তিনি ভাবে যেন অভিভূত হয়ে গেলেন। তাঁর উচ্ছ্বসিত কথা-বার্তায় বুঝতে পারলাম তিনি কত খুশী হয়েছেন।

কবিরাজ মশাই অর্থাৎ শ্রীগোপীনাথজী অনেক সময় তাঁর চৌকির উপরে চুপ ক'রে ব'সে থাকতেন। ব'সে থাকতেন ঘণ্টার পরে ঘণ্টা নিশ্চল পাথরের মূর্তির মত। একজন মহাযোগীর মত। তাঁর অন্তর-জগতে কী যে চলত তা কে জানে। বাইরে কোনও তরঙ্গ ছিল না। যেন এক নিস্তরঙ্গ মহাসমুদ্র।

তাঁর কাছে অনেকে আসতেন। তাঁর কন্যা শ্রীমতীসুধা দেবী তাঁর

সেবার জন্য তাঁর কাছেই থাকতেন। আমার সঙ্গে মাঝে মাঝে তাঁর চলত সুখ দুঃখের গল্প। তার বাবা অর্থাৎ আমাদের গোপীনাথজীর সম্বন্ধে কত কথা শুনতে পেতাম।

এইভাবে দিন, মাস এবং বৎসর অতিবাহিত হয়েছে। আমার জীবনেরও একটা পর্যায় এইভাবে কেটে গেছে। শ্রীশ্রীআনন্দময়ী আশ্রমে এই সময়ে আমার কেটে গিয়েছিল অনেকগুলো বৎসর। এইভাবে সেইখানে বার বৎসর অতীত হয়ে গেল। একেবারে শেষ দিকটায় আমি চ'লে গেলাম ব্রহ্ম-কর্ম-কেন্দ্রে। এই কেন্দ্র আমাদের কাজের কেন্দ্র। যে ভাব-ধারাতে আমি নিজে চলেছি তারই কাজের জন্য এই কেন্দ্র।

স্বভাবতই আমি ভালবাসি গান বাজনা। আর আমি ভালবাসি লেখাপড়া। বরাবর এইরকম। আমার জীবনে পড়াশুনো একটা প্রধান উপজীব্য। যখন এই আত্মকথা লেখা হচ্ছে তখনও আমি অনেকসময় থাকি বই নিয়ে।

বই আমার বন্ধু। বই আমার আত্মীয়। বই পড়তে পড়তে আমার অন্তরের মধ্যে অন্তরের কথা চলে। সত্যিকথা বলতে কি বই হচ্ছে আমার প্রাণ। বই নিয়ে থাকা মানেই প্রাণের সঙ্গে প্রাণের কথা, প্রাণের কাছে প্রাণের বার্তা।

বই কি আমার খুব একটা প্রয়োজনের বস্তু? না-ও বটে, হাঁ-ও বটে। এক হিসাবে বইতে আমার কোনও প্রয়োজন নেই। আর একটা হিসাবে বইকে আমার চাই। দরকার নেই তবু চাই। বই যে আমার good company. আমার কাছে যারা আসে তারা অনেকসময় আমার মনের খোরাক জোটাতে পারে না। তারা আমার প্রাণের ক্ষুধা মেটাতেও পারে না।

আমার মনের খাদ্য জোটায় এবং পিপাসা মেটায় পুস্তকরাশি। আর কিছু নয়, পুস্তকরাশি। তাই বই আমার সঙ্গী।

ব্যাপারটা কি বুঝতে পারছ? পুস্তক মানেই চিন্তা। পুস্তকের মধ্যে ধরা প'ড়ে আছে বড় বড় গুণী, জ্ঞানী এবং চিন্তাশীল মানুষের

ভাবনারাশি। তাঁদের অনুভব, তাঁদের শিল্প, তাঁদের ইচ্ছা, তাঁদের কল্পনা—সমস্তই পুস্তকের হরফের মধ্যে ধরা প'ড়ে আনন্দে আনন্দ বিস্তার করছে। তাই আমি ভাল বই পেলে নিশ্চিন্তে কাল যাপন করি।

এবার আমার সেই কথায় আসি। আমি আমার চিরটা জীবন কাটিয়ে দিলাম গান-বাজনা নিয়ে এবং বই পুস্তক নিয়ে। আর একটা দিক তো আমার আছেই। আমার অন্তরের গভীর চিন্তা। সঙ্গে সঙ্গে আমার ভাব ও ভাবনা। এই সমস্ত নিয়ে আমি আমার জীবন কাটিয়ে দিলাম। অনেকখানি তো কেটে গেছে। আর কতটা বাকী আছে কে জানে।

বছর ছয়েক আগ পর্যন্ত আমার সময় কাটছিল কাশীতে। একরকম গঙ্গার ধারেই বলা চলে। এগারটা বৎসর কাটিয়েছি শ্রীশ্রীআনন্দময়ীমার আশ্রমের Guest-house এর একটি ছোট ঘরে। ছোট মানে খুবই ছোট একটি ঘর। আলো বাতাসের বালাই নেই বললেই চলে। সেই ঘরে কেটেছে এগারটা বৎসর। আর একটা বৎসর কাশীতেই নানান জায়গায়। নানান জায়গায় হ'লেও সবই মাতা আনন্দময়ীর এলাকার মধ্যে।

পরিচ্ছেদ—৪

তারপরে সহসা হ'ল যবনিকাপাত। একটি দুরন্ত অসুখ এসে আমাকে আক্রমণ করল। Cerebral attack হ'ল। আমি একেবারে শয্যাগত হয়ে পড়লাম। আমার ডান দিকটা প'ড়ে গেল। আনন্দময়ী মায়ের হাসপাতালে শুয়ে রইলাম তিনটে মাস। সেই কাহিনী একটু বলি।

হাসপাতালে শয্যাগত অবস্থায় আমার কষ্ট হয়েছিল খুবই। এ তো

বলা বাহুল্য। শরীরের দিক তো আছেই। আবার আরও কত দিক। আমি একেবারে অথৈ জলে প'ড়ে গেলাম।

সবই সত্য। কিন্তু আমি বলতে পারি, সেই সময়টা আমার জীবনে একটা চরম আনন্দের সময়। একটা স্বর্ণ যুগ। কেমন যেন একটা উৎসাহ এবং আনন্দ আমাকে প্রায়ই উদ্বেল ক'রে তুলতো। আমার যেমন উৎসাহ তেমন আনন্দ। অবসাদ কিছু নেই। দুঃখ থাকলেও ছিল অফুরন্ত উচ্ছ্বাস এবং আনন্দের আলোক। কত লোক আমার সঙ্গে দেখা করতে আসত অথবা আসতেন।

শেষের দিকে একটুখানি যখন সুস্থ হয়েছি, তখন মাতা আনন্দময়ী একদিন আমাকে দেখতে এলেন। মা আমাকে তো চিরকালই দেখে আসছেন। মায়ের সঙ্গে দেখা হয়েছে অবধি মায়ের খেয়াল আমার উপরে বরাবরই ছিল। কত সুখে, কত দুঃখে, কত আনন্দে মা আমার জীবনে সাক্ষীস্বরূপ হয়ে রয়েছেন।

প্রথম জীবনে মায়ের কাছে যাওয়ার পরে সেই একবার কঠিন হাঁপানি হয়েছিল আমার। আমি বলতাম- কখনও কখনও বলতাম— অভয়চন্দ হাঁপানি, হাঁপানি কমলে লাফানি। মনে পড়ছে, অনেক সময় মায়ের কাছে শুয়ে থাকতাম— হয়তো শুতে পারতাম না, ব'সেই থাকতাম রাত্রিবেলায়। হয়তো এক সময়ে একটু শুতে পারলাম। এইরকম চলত। দুই, তিন বৎসর পরে সেই হাঁপানি কেমন ক'রে যে কোথায় চ'লে গেল তা আর বলতে পারি নে।

চিকিৎসা কি হয়নি? চিকিৎসা অনেক হয়েছে। ডাক্তার জ্ঞান মজুমদার, হোমিওপ্যাথ— তিনিও আমার চিকিৎসা কিছু করেছিলেন। কিন্তু কেমন ক'রে হাঁপানি যে সেরেছিল সেই কথাটা আমি কিছুতেই বলতে পারছি না। হাঁপানি রোগ এসেওছিল আবার চ'লেও গেল। তবে মনে পড়ছে, কয়েক বৎসর পর্যন্ত বেশী ঠাণ্ডায় বা অন্য রকম অনিয়মে হাঁপানি বাবাজী একটু একটু দেখা দিতেন। সে যৎসামান্য।

আবার মায়ের কথায় আসি। মায়ের কথা আমার জীবনে বোধহয় আর ফুরোবে না। মায়ের সঙ্গে সকল বিষয়ে আমি এক মত নই— এ কথা বলাই বাহুল্য। মায়ের আচরণ সব সময়ে আমার ভাল লাগে না। মায়ের ব্যবহারের মধ্যে আমি অনেক সময় পাই একটা অসামঞ্জস্য — ছন্দের অভাব। আমার জীবনের ছন্দের সঙ্গে মায়ের ছন্দ অর্থাৎ মায়ের জীবনের ছন্দ অনেক সময় দেখছি মিলছে না।

মায়েরও তো একটা দিক আছে। বুঝতে পারি সে কথা। মায়েরও কিছু বলবার আছে। মায়ের সেই বলবার কথা আর পাঁচটা কথার মত নয়। মায়ের কথাও ভাল কথা। মায়ের কথাও অবশ্যই সুন্দর কথা। মায়ের কথা অবশ্যই অনেকের ভাল লাগে। অনেকের জীবনে মায়ের কথা সোনার অক্ষরে লেখা থাকে। এ সব কথা আমি বুঝতে পারি। বুঝতে পারব না কেন। বুঝতে না পারার কি আছে।

তবু, মায়ের প্রত্যেকটি কথায় আমার মন সায় দেয় না। এই ব্যাপারটা ঠিক কবের থেকে যে আরম্ভ হয়েছিল সে কথা আমি বলতে পারছি না। আমার যেন মনে হয়, এটা কোনো দিন ঠিক আরম্ভ হয় নি। হয়তো এটা আমার জীবনে চিরকালই ছিল।

তবে এটা ঠিক, আমার জীবনে প্রথম যুগে অর্থাৎ মায়ের কাছে আমার যাওয়ার পরে পরে মাকে ভালবাসতাম অত্যন্ত বেশী। মা-ও আমাকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। এই আমাদের প্রচলিত দুনিয়ায় সেই ভালবাসার বুঝি আর তুলনা হয় না।

মা আমার জন্য কত কি করেছেন। কত কিছু করেছেন। আমি নতুন গেছি। পরে আমি পুরোনো হয়ে উঠলেও মায়ের সঙ্গে আমার ছন্দটা ছিল স্বচ্ছন্দ। তখন আমি ছেলেমানুষ। মাকে আমার ভয় ছিল না। মায়ের জোরেই জোর। ব্যবহারিক কথা বলছি কিন্তু। মায়ের জোরে আমার দারুণ জোর। কিন্তু তারও মূলে কথা আছে। আমার মধ্যে প্রকৃত জোরটা ছিল সত্যের জোর। আশ্চর্য একজনের

আশ্চর্য জোর। সেই জোরে আমি থাকতাম আপন ভাবে, আপন মনে, আপন আনন্দে। দুঃখ অনেক ছিল। মনুষ্য-দেহধারীমাত্রেরই অনেক দুঃখ থাকে। তারমধ্যে যার যত জড়তা তার তত দুঃখ কম। যার যত চেতনা তার তত দুঃখ বেশী।

সুখ বা আনন্দ দুটোকে মিশিয়ে কিন্তু কথাটা বললাম। দুটো এক জাতীয় বটে, কিন্তু ঠিক এক নয়। এক হওয়া সত্ত্বেও এক নয়। আমার পরিভাষা অনুসারে সুখ বস্তুটা স্থূলের দিকে। আর আনন্দ বস্তুটা সূক্ষ্মের দিকে। সুখের হিসাব মোটা হিসাব। আনন্দের হিসাব যেন প্রাণের হিসাব।

আনন্দ শব্দটা সাধারণ অর্থেও ব্যবহার হয়। মোটা হিসেবেও ব্যবহার হয়। অনেক সময় যে কোনো প্রকার সুখকেও আনন্দ ব'লে অভিহিত করি। আবার যে কোনো প্রকার আনন্দকেও সুখ ব'লে যে বলি না তা নয়। "পরমং সুখম্" কথা আছে। আবার আছে "পরম-সুখদম্"। সুখ হ'ল তাই—যা চাই। দুঃখ হ'ল তাই যা চাই না। এইভাবে আমরা সুখ দুঃখকে ভাগ ক'রে নিয়েছি।

মায়ের কথা চলছিল। প্রথম যুগে মাকে আঁকড়ে ধরবার চেষ্টা করেছিলাম। সেই যুগে মাকে আমার জীবনে প্রধান স্থান দিয়েছিলাম। অন্তত দিতে চেয়েছিলাম।

মাকে প্রধান ক'রে নিলেও মা আমার জীবনে প্রধান হয়ে ওঠেন নি। অন্তত প্রধান হয়ে থাকেননি। কেন জানি না অনেক সময়েই দেখেছি মায়ের আর আমার ভিতরে একটা ফাঁক থাকত। কেন যে ফাঁক থাকত সে কথা আমার পক্ষে খুলে বলা মুশকিল। হয়তো ফাঁক আছে ব'লেই ফাঁক থাকত। ফাঁকটা বোধহয় চিরকালই আছে।

আনন্দময়ীমার সঙ্গে থাকা কালে আমি যে ডায়েরী লিখতাম তা খাতার পরে খাতা। প্রায় এক বাক্স খাতা লিখেছিলাম অনেক বছর ধ'রে। এখনও সেই সব রাখা আছে। এখন আমার মনে একটি পরি-

কল্পনা এই—আমি একটি বই লিখব শ্রীশ্রীআনন্দময়ীমাকে নিয়ে। মায়ের সঙ্গে আমার যা কিছু সম্পর্ক ছিল, মায়ের সঙ্গে আমার যা কিছু ব্যাপার হয়েছে, মাতে আর আমাতে যত কথা হয়েছে, যত হয়েছে রাগা-রাগি অথবা অন্য কিছু—সে সমস্ত আমার এই বইতে থাকবে অল্প কথায়। যতদূর প্রকাশ করতে পারা যাবে ততদূর প্রকাশ ক'রে যাব।

সে তো একটু আধটু ইতিহাস নয়। সেই ইতিহাস বিরাট এবং বিশাল ইতিহাস। কত কবিতা, কত কথা, কত গল্প আরও কত কি। যা-কিছু ঘটেছে সেই একজনের ইচ্ছাতেই ঘটেছে।

মায়ের সঙ্গে থেকেছি বছরের পর বছর। মায়ের সম্পর্কে থেকেছি আরও অনেক বছর। সর্বশুদ্ধ মায়ের সম্পর্কে ছিলাম সাড়ে চব্বিশ বছর—দু বারে। জীবনের আমার সোনার সময়টা কেটে গেছে মায়েরই কাছে কাছে। তারপরে সহসা মায়ের আশ্রম ছেড়ে কলিকাতায় চ'লে এলাম। মা তখন জীবিত আছেন। আমার চ'লে আসার বছর দুয়েক পরে মা দেহ রাখলেন দেরাদুনে। মায়ের দেহত্যাগের অল্পকাল পূর্বে—হয়তো মাস কতক পূর্বে মা আমার কাছে একখানা চিঠি দিলেন, আমার চিঠির উত্তরে। সেই চিঠিখানি ঠিক আমাকে লেখা নয়, লেখা কীর্তন-সভার কর্মিবৃন্দকে। সুন্দর সেই চিঠি।

পরিচ্ছেদ—৫

এই যে আমার জীবন-কথা লেখা হচ্ছে, এই কথা কিন্তু ধারাবাহিক কথা নয়। যখন যেটা মনে আসছে তখন সেটা বলছি। আমি ব'লে যাচ্ছি আর একজন ব'সে ব'সে লিখছে। বেশীর ভাগই লিখছে আমার রাধু মা। প্রায় সবটাই আমার রাধু মার হাতের লেখা। যে অংশটা

প্রেসে গেছে সেটাও তাই। বইটার আমি নাম দিয়েছি—নতুন ক'রে নাম দিয়েছি—'আমার জীবন-কথা কিছু ব'লে যাই'।

আমার জীবন-কথা তো একটুখানি কথা নয়। আমার জীবন-কথা অনেক কথা। সে সব কথা সমস্ত খুঁটিনাটি সমেত প্রকাশিত করা একেবারেই সম্ভব নয়। শুধু আমার কেন, কোনো মানুষেরই জীবন কথা সবখানি প্রকাশ করা যায় না। প্রকাশ করলেও মানুষের কিছু সুবিধা হয় ব'লে মনে হয় না। জীবনে অনেক আন্তর কথা থাকে, আবাব অনেক থাকে অবান্তর কথা, যাকে বলে ফালতু কথা। সব মিলিয়েই মালা গাঁথা। কিন্তু মালাতে কাঁটা থাকলে চলে না। পোকা থাকলেও চলে না। জীবনের ফুলবাগানে অনেক সময়ে এমন সব আগাছা থাকে যেগুলো বাদ দিয়েই চলতে হয়। সমস্ত নিয়েই জীবন। যা কিছু সমস্ত একমাত্র ধ'রে দেওয়া চলে সেই একজনের পায়েব কাছে। অর্থাৎ ভগবানের পায়ের কাছে। ভগবানের কাছে যেতে হয় যেমন আছি তেমনি।

আমি যেমনই ঠিক তেমন তোমাব কাছে চ'লে এসেছি। লুকিয়ে চুরিয়ে কিছুই লাভ নেই। কিন্তু ব্যবহার জগতের কথা অন্যরকম। কিয়ৎ পরিমাণে অন্যরকম। ব্যবহার জগতে কিছু পরিমাণে সাজিয়ে গুছিয়ে নিয়ে চলবার প্রয়োজন আছে। মানুষের জন্যই তো যত কাজ। মানুষের কাজে লাগবে সেই জন্যই তো কাজ। লোকের ভাল লাগলে তবেই তো সার্থকতা। ভাল না লাগলে যা কিছু জমাই সে সব শুধু অবান্তর নয়—জঞ্জাল। মানুষের জন্য জঞ্জাল জমিয়ে কাজ কি।

আবর্জনা অনেক আছে। আবর্জনা অনেক থাকে। আবর্জনা অনেক ছিল এবং থাকবে। কিন্তু তারই মধ্য থেকে কিছু কিছু নিয়ে গুছিয়ে—মনের মত ক'রে সাজিয়ে রাখতে হয়—মানুষরূপী ভগবানকে নিবেদন করতে হয়। সেখানে কিছুটা বাছাইয়ের প্রয়োজন আছে।

লোকের জন্য লেখা হচ্ছে। লোকের কাজে লাগুক। কাজে লাগুক মানে সেবায় লাগুক। লোকে যদি আনন্দ পায় এবং সেই আনন্দে

তার যদি কোনো ক্ষতি না হয়, সেইখানেই মস্ত সার্থকতা। লোকের ভাল লেগেছে, মানুষ আনন্দ পেয়েছে, সেইটেই তো বইখানার দাম। আর একটু কথা। যেখান থেকে আনন্দ ছড়িয়ে পড়ে সেখান থেকে আলোকও বিকিরিত হয়।

অতএব কথাটা দাঁড়াল এই, সবরকম নিয়ে – যা কিছু সমস্ত একত্র ক'রেই ভগবানের চরণ কমলে পৌঁছে যেতে হয়। সমস্ত-- সমস্ত— সমস্ত। যা কিছু সমস্ত। এইজন্যেই গীতাতে আছে 'তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত'। আমি যেমন ঠিক তেমন তাঁর কাছে গিয়ে হাজির হব। তাঁর পায়ের কাছে গিয়ে আছড়ে পড়ব—আমাকে তুমি গ্রহণ কর ব'লে। তাঁকে বলব, তুমি আমাকে দেখ আমি চোর কি জোচ্চোর। আমি কপট কি সরল। আমাকে তুমি দেখ। আমাকে তুমি ভাল ক'রে দেখ। এইভাবে তাঁর কাছে উপস্থিত হ'তে হয়।

কিন্তু মানুষের কাছে নৈবিদ্যের থালা যখন নিয়ে যাব, তখন সেই থালাকে ভাল ক'রেই সাজাব। না সাজিয়ে গুছিয়ে নিয়ে গেলে মানুষ বুঝবে না। ঈশ্বর কিন্তু সব বোঝেন। ঈশ্বর কিন্তু সব জানতে পাচ্ছেন। তাই ঈশ্বরের ক্ষেত্রটা একেবারেই আলাদা।

আমি ভাল ক'রেই জানি, ঈশ্বর যেমন বিচিত্র এবং আশ্চর্য তাঁর ভজনও তেমন বিচিত্র এবং তেমনই আশ্চর্য।

হিসেব ক'রে, সব দিক বজায় রেখে নিয়মমাফিক জগতের সমস্তই লাভ হ'তে পারে, জগতে আমি একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ব'লে সম্মানিতও হ'তে পারি।

কিন্তু ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক অন্যরকম। সেখানে কোনো হিসেব নেই। লোক-লৌকিকতা বলতে যা বোঝায় সেগুলোকে আগেই বিসর্জন দিতে হবে। সেইজন্যেই আমার একটি কথা আছে—চালাকি ও ছলনার পথে তুমি যেও না।

এই দুনিয়ায় একটু আধটু চালাকি ও ছলনা ভিন্ন বাস করাই যায় না,

অনেকে এই কথা বলে। হয়তো বা তাই। ভাল মানুষেরা সেই বুঝেই ব্যবহার ক'রে থাকে। যারা সংসারে ভাল মানুষ তারা সবাই গুছিয়ে গাছিয়ে, ঠিকমত সাজ পোশাক প'রে সকল দিক বজায় রেখে সুন্দর চলতে পারেন।

কিন্তু আমার তো আর দিকই নেই। একটি মাত্র দিক। আমার সকল দিক কোথায়। আমার কাছে সকল নকল রূপে প্রতিভাত হচ্ছে। সেইজন্যেইতো আমি অন্যরকম। আমি মানুষের মধ্যেই না। আমি একেবারে অমানুষ। আমার সঙ্গে কারোর মেলে না। আমি এই রকমই।

আমি আর এক রকম হ'তে চাই না। আমি বুঝতে পেরেছি এই অমিলের মধ্য দিয়েই আমার জগতের সকলের সঙ্গে মিল। আমি সকলের মত না ব'লেই আমি সকলের সঙ্গে এক হয়ে যেতে পারি। আমি যে সকলের সঙ্গেই এক। আমার মধ্যে সব, সবের মধ্যে আমি।

আমার জীবনটা এরকম। কি আর করা যাবে। মারা যায় বাউন করা যায় কি। বাস্তবিকই এই বিশ্বজগতের মধ্যে আমি একা। একা হ'লেও আমি সঙ্গীহীন নই। আমার কাছে আছে এবং থাকে অনেক— বহু—নানা।

সত্যিকথা বলব? আবার সেই কথা। সত্যি কথাই তো আমি বলি, মিথ্যে কথা তো কখনও বলি না। তবু এটা একটা রঙ্গ। আমি বলছি, এই সমগ্র বিশ্ব-জগৎ - যেখানে যা কিছু আছে, ছিল এবং থাকবে সমস্ত, সমস্ত আমার কাছ থেকেই প্রকাশ পেয়েছে। আমি দেখছি ব'লে সবাই আছে। আমি জানি ব'লেই এই বিশ্ব-জগৎখানা আপন ছন্দে স্পন্দিত হচ্ছে। আমার জানার উপর, আমার বোধের উপর, আমার ভাবের উপর সকল রয়েছে। সবাই রয়েছে। আমি, তুমি, তিনি—কেউ বাদ নেই।

এই একটি আশ্চর্য দিকের আশ্চর্য অনুভূতি। আমার কাছে আমি

গান গেয়ে যাই। আমার সঙ্গে আমি কথা বলি। আমার ধারই আমি ধারি। অন্য কারও ধার আমি ধারি না। আমি আমার মধ্যে আপন ছন্দে স্বয়ং বিরাজমান।

যে কথা চলছিল। তবু আমার ব্যবহারিক দিকটা আমি পালন ক'রে থাকি। যতটুকু হয় পালন করি। একটা ছন্দ মানি। একটা ছন্দ মেনে আমি জীবন যাপন করি। এইটেই আমার স্বভাব।

আমার গুরুদেব বলতেন—তাঁর জীবনের অনুভূতির কথা বলতেন—কি যেন কোন্ দিক লক্ষ্য ক'রে বলতেন—আমি আছি, অনিয়ম আছে, আর জ্যোতি আছে। শ্রীশ্রীসিদ্ধিমাতা প্রসঙ্গ নামক গ্রন্থে এই কথার উল্লেখ আছে।

আমি আমার কথা বলছি। আমি আমারই কথা ব'লে যাই। অন্যের কথা বলবার সামর্থ্য আমার নেই। আমি আমার গান গেয়ে চলি। এইভাবে আমার যা কিছু কাজ, সমস্ত কাজ করা হচ্ছে। আমার জগতে একমাত্র আমি আছি। আর বাকী যা কিছু আছে সমস্তই আমার ছায়া। আমার ছায়ার তলায় আমার বাস।

জগৎটা কি মিথ্যে? জগৎটা কি মনের ভুল? জগৎটা মোটেই মিথ্যা নয়। জগৎটা মিথ্যে তো নয়ই, জগৎটা ভুলও নয়। তবে কিনা এই জগৎ আশ্চর্য জগৎ। এমন এক আশ্চর্য জগৎ যে এর সম্বন্ধে কিছু কথা বলতে গেলেই অসুবিধায় প'ড়ে যাই। ভাব আসে তো ভাষা আসে না, ইচ্ছা আসে তো ইচ্ছার পূরণ হয় না। যা কিছু আমি বলতে যাই অনেক সময় ঠিক আমার মনের মতন হয় না।

তবু আনন্দ হয়। আনন্দ বস্তুটা যে আমার ভিতরে রয়েছে। সেই কারণেই আনন্দের অভাব হয় না।

তবে একটি কথা। আনন্দ সবাইকারই আছে। কিন্তু অন্যের আনন্দ আর আমার আনন্দ এই দুইতে একটুখানি পার্থক্য আছে। আমার যে আনন্দ সেটা আমার জীবনের মধ্যে উছ্‌লে উছ্‌লে ওঠে আবার

যেন উপ্‌চে উপ্‌চে পড়ে। তবু আনন্দের একটা স্রোত ব'য়ে চলেছে। কখনও কখনও ফাঁকে ফাঁকে একটু বৈচিত্র্য এসে দেখা দেয়। হয়তো দুঃখ এল। হয়তো বা এল একটা অতৃপ্তি। তবু এ কথা আমার জানা থাকা উচিত, এ সমস্তই আনন্দের ছদ্মবেশ। সর্বদা ওয়াকিবহাল থাকি, এ কথা বলতে পারি না। এই কথা বলা যায়, আমাব এই জীবনেব মধ্যে বাবে বারে আনন্দ এসে উঁকি দেয়। অন্তত বর্তমানে দেয়। অনেক কাল ধ'বেই দিচ্ছে। হয়তো বা চিরকালই দিচ্ছে।

কখনও কখনও এমনও হয়, আমি উল্টো গাইতে শুরু করি। তা হয়। জীবনে অনেকবার উল্টো গেয়েছি। যেমনটা গাইলে ভাল হয় তেমনটা গাওয়া হয়নি। যেরকম গানে ছন্দের মিল থাকে, সুরের সামঞ্জস্য থাকে সেরকম গান তো সকল সময় গাইতে পারি না। অথবা বলি, গাওয়া হয় না। কে যেন আমাকে তাঁর ইচ্ছেমত চালিয়ে নিয়ে বেড়ায়। আমার অবস্থাটা এইরকম।

মনে করি অথবা বলি, মনে হয়, আমার 'আমি'র ভিত্তিটা— আমাব আমিত্বটা খুব একটা পাকা বস্তু নয়। এইটাই তো ভাল কথা। এই কথাই তো চাইবার মত কথা— প্রার্থনার বস্তু। আমিত্ববিহীন আমি নিয়ে আমার কাজ কারবার। আমিটা বুঝি হেলে দোলে নড়েচড়ে। আমির মূলে কে যেন রয়েছে। আমার আমি সেজে কে যেন অভিনয় করছে। আমার আমিটা যেন তার রঙ্গ ভঙ্গিমা।

এও এক মুশকিল। তাকে এবং সকলকে নিয়ে আমি রয়েছি অথবা আমাকে নিয়ে এবং আর সবাইকে নিয়ে সে রয়েছে। এটাই তো এখানে সমস্যা। সে যা হোক, একজন কেউ রয়েছে। এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। সেই একজন কেউ আমিই হই, তুমিই হও অথবা সে-ই হোক। অথবা এমনও হ'তে পারে সেই ব্যক্তিই এই তিনজন সেজে ব'সে আছে। একজন সেজেছে তিন জন। একজন সেজেছে সকল জন। সেই যে আমি লিখেছিলুম—

Mere words are I, you and He
oh ! that reality can you see ?

সেই কথাটাই এখানে মনে প'ড়ে যায়।

ধান ভানতে শিবের গীত। এক কথা বলতে আর এক কথা। যা বলতে বসেছি তার থেকে কি দূরে স'রে যাচ্ছি। কি কথা যেন বলতে বসেছি। আমি আমারই জীবন-কথা কিছু জানাব। কোথায় আমার জীবন-কথা, কোথায় বা এক তত্ত্ব কথা। ব'সে ব'সে ভাবছি আমার জীবন-কথাটাইতো তত্ত্ব কথা।

কথাটা এই রকম—আমার জন্ম তত্ত্বের অথবা তত্ত্ববস্তুর মধ্য হ'তে। তত্ত্ব অথবা তথ্য অথবা সত্য—সকলই সেই এক জায়গা থেকে জাত। সেইখানটা পরম। সে মূলকে নাম দিয়েছি পরম। পরম সেই অর্থ হ'তে আমি যেন ছট্‌কে বেরিয়ে এসেছি। মনে হয়, পরম সেই অর্থ-ই অর্থাৎ পরমার্থ ই আমার উৎস। আমার পিতাও সেখানে আমার মাতাও সেখানে। আমি যে সেখানকার মানুষ।

পরিচ্ছেদ—৬

এইবারে আর এক কথায় আসি : সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই। মানুষের উপরে কিছুই নাই। মানুষকে বাদ দিয়ে সবই মূল্যহীন। মানুষই শেষ কথা।

আরও অনেক কিছু আছে বটে, কিন্তু সে সব মানুষকে নিয়েই। অনেক কিছুই কেন, সব কিছুই আছে। কিন্তু সব কিছুই মানুষকে ধ'রে।

আমাদের এই দুনিয়াতে কী দেখতে পাই। দেখতে পাই, মানুষ তার কল্পনার জগতে বিচরণ করছে। কল্পনার ঘোরের মধ্যে বাসা

বেঁধেছে। আবার কল্পনার কুজ্ঝটিকায় পথ হারিয়ে এক জায়গাতেই বারংবার করছে গতাগতি। কল্পনা আর কল্পনা। কল্পনার জগতেই তাব জীবন কেটে যায়। কল্পনাকে অবলম্বন ক'রেই সে বেঁচে থাকে এবং ম'রে যায়।

কল্পনা একটা জিনিস, আশা আর একটা জিনিস। কল্পনাও করে, আশাও করে। কল্পনা আব আশা, আশা আর কল্পনা। মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত। মানুষের দৌড় ওই পর্যন্ত। কল্পনা ক'রে এবং আশা ক'রে কোথায় গিয়ে পৌঁছবে তার দিকে খেয়াল নেই কিন্তু। আশা নিয়ে ভবিষ্যতের দিকে ধাবমান হয়। কল্পনার গতিতে যায় সকল দিকেই। তবে তাতে বর্তমানটাই উজ্জ্বল হয়ে উঠতে চায়।

পরিচ্ছেদ—৭

আমার গল্প আমি ব'লে যাচ্ছি। এ কিন্তু গল্প হ'লেও সত্যি। আমার গল্পের সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু আমার ভাব লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে। আমার জীবনের ভাবনা—সেও এসে যাচ্ছে কিছু কিছু। আবার এমন সব সিদ্ধান্ত কিছু আসছে যার আমি সাক্ষাৎ পেয়েছি। সাক্ষাৎকার করা হয়েছে এমন সব কথাই আমি রেখে যাচ্ছি প্রধানত। অন্যরকম কথা দুটো চারটে আসছে তো বটেই। সে তো আসবেই। মোটের উপর কথাটা এই, আমি একটা বলের মত গড়িয়ে চলছি। উপমাটা লাগসই হ'ল না। আমি চলেছি জলের ধারার মত। রাস্তা যেমনই হোক, খানা, খন্দ যতই থাকুক জলের এই ধারা চলেছে আপন ছাঁদে। তারপরেতে —দেখি কোথায় গিয়ে ঠেকি।

আমার জীবনের বিচিত্র কথা এই, জনা কয়েক বৃদ্ধা মহিলা আসতেন

আমার কাছে তাঁদের বাৎসল্য স্নেহ নিয়ে। একজন নয়, কয়েকজন। আমি চিরদিনই এক পাগল। এই পাগলকে তাঁরা যে স্নেহ দিয়ে গেছেন তার তুলনা আমি আমার এই ছোট্ট জীবনে পাইনি।

অবশ্য যা কিছু ঘটেছে সমস্তটা একটা সময়ে ঘটেনি এটা বলাই বাহুল্য। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকম ঘটেছে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকমের বৃদ্ধা মহিলা আমার কাছে এসে পড়েছেন তাঁদের স্নেহ এবং ভালবাসার সম্ভার নিয়ে। কী বিচিত্র তাঁদের কথা, কী বিচিত্র তাঁদের প্রসঙ্গ। এইবারে তাঁদের কথা কিছু বলব। তাঁদের মধ্যে একজনের কথা আমি আগেই বলেছি। প্রসিদ্ধ একজন বাঙালী কবির তিনি মা।

তাঁর কথা ছেড়ে এবার আর এক জনের কথায় যাই। ইনি দিল্লীর মানে পুরানো দিল্লীব একটা অংশে থাকতেন। তাঁর স্বামী ছিলেন একজন পণ্ডিত মশাই। তাঁর ছেলেমেয়ে ছিলেন চার পাঁচটি। এখনও হয়তো তাঁর ছেলেমেযেরা দিল্লী অঞ্চলে বাস কবছেন এবং সুখে স্বচ্ছন্দে অবস্থান করছেন। অবশ্য আমি তাঁদের খবর অনেক কাল জানি না।

আমি তখন থাকতাম বেয়ার্ড রোডের একটা দিকে। আমার বিবাহের কিছু পরে যখন দিল্লীতে তিন বছর ছিলাম সেই সময়কার কথা বলছি। সেই সময় তিন খেপে তিন জায়গায় ছিলাম। শেষের দিকটায় ছিলাম ওই বেয়ার্ড রোডে।

নিউ দিল্লী এবং ওল্ড দিল্লী এই দুই দিল্লী একেবারে পাশাপাশি অবস্থিত। নিউ দিল্লী একেবারে সাজানো শহর। ওল্ড দিল্লী সেরকম নয়। ওল্ড দিল্লী ঘিঞ্জি এবং জনবহুল। আমি থাকতাম নিউ দিল্লীতে। সাইকেলে ক'রে ঘোরাঘুরি করতাম। আগেই বলেছি রাস্তাগুলো চমৎকার। যতদূর মনে পড়ে দু ধারে গাছের সারি। দু ধারে গাছওলা রাস্তাকে ইংরাজীতে বলে avenue. নিউ দিল্লীতে avenue অনেক। আমার তখন জোয়ান বয়েস। সাইকেলে চেপে নিউ দিল্লীর রাস্তায় আপন মনে চলেছি আর চলেছি। গান শিখিয়ে বেড়াচ্ছি। দিল্লী অথবা নিউ দিল্লীতে

যখন গিয়ে উঠলাম তার কিছু পরেই কলিকাতায় গিয়ে আমি আমার সহধর্মিণী যমুনাজীকে নিয়ে এলাম। সঙ্গে একটি শিশুসন্তান।

আমি আছি দিল্লীতে অর্থাৎ নয়া দিল্লীতে। পংকজ সেনের বাড়ীতে গান শেখাতে যাই তাঁর স্ত্রীকে। আরও কত জনকে গান শেখাই। মেয়েরাই বেশী গান শিখেছেন। গান শিখেছেন তুষারদি, ইরা, তারা আরও কত মেয়ে। ছোট বালিকাও আছেন, মাঝারি বয়সের মেয়েরাও আছেন, প্রাপ্ত বয়স্কা ঘরের গৃহিণীও আছেন। এরমধ্যে একবার শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর জন্মোৎসবও ওখানে পালিত হ'ল। বিরাট হইচই, অনেক ধূমধাম। সেই সময়ে আমি দুই দিন দুইটি পালা-কীর্তন করেছিলাম। সেকথা আগেই উল্লেখ করেছি মনে পড়ছে।

যে কথা চলছিল আমাদের। আমার কাছে আসতেন সেই সীতারাম বাজারের মা। ছুটে ছুটে আসতেন বললেই ঠিক মত বলা হয়। ওল্ড দিল্লীর থেকে নিউ দিল্লী। খুব বেশী দূর না হ'লেও খুব একটা কম দূরও নয়।

আমার কাছে আসতেন আমার সেই মা, সীতারাম বাজারের মা, আমরা বলতাম সীতারামের মা। নামটা তাঁর ভুলেই গেছি। তাঁদের বাড়ীতেও দু একবার গেছি। তাঁরা বৈদিক ব্রাহ্মণ। লোকের বাড়ীতে পুজো আচ্চা করতেন পণ্ডিত মশাই—সীতারাম বাজারের মায়ের স্বামী। তাঁদের বাড়ীর আবহাওয়া হিন্দু পরিবারের মতই আবহাওয়া। বরং তার থেকে এক কাঠি উপরে।

বেয়ার্ড রোডে আমি থাকতাম শরৎবাবুদের বাড়ীতে। সমস্তই গভর্ণমেণ্ট কোয়ার্টার। শরৎবাবুরা আমাকে একখানা ঘর দিয়েছিলেন থাকবার জন্য। একেবারে ছোট্টো একখানি ঘর। দরজা বেশ ভালই ছিল। অন্য ব্যবস্থা কোনো রকম। নিউ দিল্লীর মতন জায়গায় থাকবার জন্য যে-কোনো একখানি ঘর পাওয়া খুব সহজ নয়। তবে আমি পেয়ে গেলাম ওদের বাড়ীতে। আমাদের রান্না আমরাই করতাম। তবে

শরৎবাবুর গৃহিণীর কাছে সর্বপ্রকার সাহায্য পেয়েছি। সেই তিনি অর্থাৎ আমাদের চিত্রা, লীনা এবং টুনুমায়ের মা আমাদের আদর যত্নে একেবারে ঘিরে রেখেছিলেন।

এখনও মনে পড়ে ওই বাড়ীতেই ওদের বাইরের ঘরটিতে প্রতিদিন দুপুর বেলা আমরা বসাতাম পাঠের আসর। ভাল ভাল কথা অনেক পড়া হ'ত। অনেকখানি অনেকক্ষণ ধ'রে। আমার মনে পড়ছে রামকৃষ্ণ কথামৃত চলত।

আবার কোনো কোনো দিন আমরা ঈশ্বর প্রসঙ্গেই অতিবাহিত করতাম সমস্তটা দিন। অন্য কাজ সংক্ষিপ্ত। ঈশ্বর প্রসঙ্গ আর ঈশ্বর প্রসঙ্গ। হয়তো বা পাঠ আর পাঠ।

দুটি মেয়ে আসত নিকটবর্তী অঞ্চল থেকে। সর্বদাই দেখেছি মেয়েরা বেশী আসেন ঈশ্বর প্রসঙ্গে। সর্বদাই, সর্বদাই। কি সভাস্থলে, কি সাধু সমাগমে, কি পাঠে, কি কীর্তনে সকল স্থলেই মেয়েদের আগমন।

হঠাৎ মনে হয় আমাদের এই দেশে অর্থাৎ ভারতবর্ষে মেয়েদের তো আর কিছু নেই যাকে বলা হয় past time. মেয়েদের সেটা খুব কম। ক্লাব ইত্যাদির ব্যবস্থাও সে রকম নেই। গল্প করা বা গুলতুনি করা—এর স্থান হ'ল পুকুর পাড়ে অথবা অনুরূপ কোনো স্থলে।

আমার মনে পড়ে আমার ছেলেবেলা সেই গুলু ওস্তাগর লেনের বাড়ীতে আমাদের ছাদের উপরে মেয়েদের ছোটোখাটো একটি বৈঠক বসত। তাতে প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন আমার ঠাকুরমা এবং শম্ভুর পিসিমা। সারাদিন খেটেখুটে সন্ধ্যার পরে খোলা ছাদে গিয়ে ব'সেও হরেকরকম গল্প চলত

এইরকম ধরনের বৈঠক ছাড়া মেয়েদের একত্রে জোটবার অন্য ব্যবস্থা কম ছিল। আর একটা সুযোগ ছিল কোনো একটা উৎসব বা অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে মেয়েরা একত্রিত হয়ে গল্পগুজব বেশ ভালোই চলত। আসল কথা ছেলেদের মত আড্ডা মারবার সুযোগ সুবিধা মেয়েদের খুব কমই

ছিল। গুলু ওস্তাগর লেনের যে বাড়ীর কথা বললাম, আমাদের সেই বাড়ীতে ঢোকবার সময় দুটো রোয়াক ছিল চমৎকার। একটা বড়, একটা ছোট। পাড়ার ছেলে এক আধজন এসে সেই রোয়াকে ব'সে থাকত। আবার আমার পিতাকেও ক্বচিৎ কখনও দেখেছি বড় রোয়াকটাতে ব'সে আছেন।

যে কথা বলছিলুম, আমাদের দেশে অথবা আমাদের সমাজে ছেলেদের সময় কাটাবার পদ্ধতিও অন্য রকম। আবার মেয়েদের অন্য রকম। ছেলেদেরটা হল্লা প্রধান। আব মেয়েদেরটা কেবল গুজুর গাজুর, ফিসির ফাস্থর।

যেখানে জনসমাগম অথচ হল্লার আধিক্য নেই সেখানে দেখি মেয়েরাই বেশী যোগ দিয়েছেন। শুধু আমাদের দেশে নয়, আমেরিকা প্রভৃতি দেশেও তাই। স্বামী বিবেকানন্দের কাহিনীতেও পড়েছি, আমেরিকাতে মেয়েরাই যোগদান করেছেন বেশী। যতদূর জানি, মেয়েরাই স্বামী বিবেকানন্দকে সমস্ত ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছেন। খাবার ব্যবস্থা, থাকার অথবা বাঁচার ব্যবস্থা সমস্তই প্রায় মেয়েরাই করেছেন।

আমার এই কথা মনে হয়, মেয়েদের মধ্যে একটা মা নিত্য জাগ্রত। সকল সন্তানকে অথবা সকল মানুষকে পালন ক'রে তোলবার দায়িত্ব যেন মেয়েরা নিজেরাই ঘাড়ে তুলে নিয়েছে।

সমস্ত পৃথিবীর জনসংখ্যা হিসাব করলে দেখা যায় মেয়েরাই বেশী। ছিটেফোঁটা বেশী নয়, একটু বেশী পরিমাণে বেশী। জগতের মায়ের এই ব্যবস্থা।

কেউ কেউ বলেন - প্রকৃতি-বিজ্ঞানীরা বলেন, সমস্ত প্রাণী তাদের জনসংখ্যা ফলাও ক'রে তুলতে চায়। প্রাণীদের মধ্যে যিনি আছেন তিনি চান কেবল প্রাণের সংখ্যা বাড়িয়ে তুলতে। যে যেমন সে তেমনকে বাড়ায়। অন্যে অন্যকে বাড়ায়। এইভাবে চলেছে চক্রবৃদ্ধি হার। সৃষ্টির এই একটি কৌশল।

মেয়েদের কথা বলছিলুম। মেয়েদের কাজ চলেছে যেন সাক্ষাৎ মায়ের কাজ। সকল ব্যবস্থাই মা করেছেন এবং মা করছেন। ফুল ফোটানোর ব্যবস্থা, ফল ধরানোর ব্যবস্থা, সকল ব্যবস্থা, প্রত্যেক ব্যবস্থা।

সকল অবস্থাতেও, সকল ব্যবস্থাতেও তিনি। আমি কিন্তু সেই একজনকেই এ স্থলে মা বলছি। অন্য স্থলে অন্য কিছু হয়তো বলি। তাতে কিছুই যায় আসে না। যা কিছু বলি না কেন সেই একজন। দুজন নয়, তিন জন নয়, বহুজন নয়, সেই একজন। কিন্তু আমি ভাল ক'রেই জানি, একজনও নয়। সেই এক এক নয়। এক, দুই, তিন এই রকম হিসেবের বাইরে। আমি যে দেখতে পেয়েছি। দেখা শব্দটাই ব্যবহার করলাম। ইংরাজীতে to see শব্দটি আছে। আবার আছে to perceive শব্দটি। শব্দ তো অনেক আছে। আমি ভেবেই পাচ্ছি না, কি শব্দ ব্যবহার করব। কিন্তু আমি বুঝতে পেরেছি। দেখেছি বল দেখেছি, জেনেছি বল্ জেনেছি, বুঝেছি বল বুঝেছি। আবার পেয়েছি বল পেয়েছি। অথবা বল সব কটাই একসঙ্গে।

পরিচ্ছেদ—৮

কথা উঠেছে দেবদেবীর পূজা নিয়ে। এই প্রসঙ্গটা যখন উঠল তখন বুঝতে হবে সেখানে দেবদেবীর অস্তিত্বের প্রতি একটা বিশ্বাস রয়েছে। সেখানে দেবদেবী রয়েছেন আবার তাঁদের পূজাও প্রচলিত রয়েছে।

এই পৃথিবীতে বর্তমান জগতে অনেক অনেক স্থলেই ও-সকল কিছুই নেই। ওই ব্যাপারগুলোই অস্তিত্ববিহীন। অস্তিত্ববিহীন বললেই তো এ সবের অস্তিত্ব উড়ে যায় না। তবে দেব, দেবী, ভূত, প্রেত প্রভৃতি বস্তু যেখানে আছে সেইখানেই আছে। অন্যত্র এরা নেই। অর্থাৎ এদের স্থান নিতান্ত সীমাবদ্ধ।

আমার এ বিষয়ে বলবার কথা এই — দেবদেবী থাকে থাকুন। কিন্তু তুমি তোমার পরম পথে এগিয়ে চ'লে যাও। সেই পথে কত কিছুই তোমার রাস্তায় পড়বে। পড়ে পড়বে। রাস্তায় পড়াটা অস্বাভাবিক নয়। বরঞ্চ স্বাভাবিক।

কিন্তু তোমার কর্তব্য কি? সেই কথাটাই আমরা এখানে আলোচনা কবছি। তোমার অথবা আমার এখানে কি করতে হবে সেই কথাটাই মনের মধ্যে আসছে।

দেবদেবীর প্রশ্ন এক বিরাট প্রশ্ন। এ কথা কম কথা নয়। তবু আমি আমার অভিজ্ঞতা এবং ভাব এখানে বিবৃত করছি। আমার আশা, এই প্রসঙ্গ অনেকের কাজে লাগবে — অনেকের কল্যাণ সাধন করবে।

আমরা যারা এই পথে চলেছি অর্থাৎ কি না গুরুর নির্দেশ মত অগ্রগামী হওয়ার পথ গ্রহণ করেছি তাদের সম্বন্ধেই যত কথা। যে আমাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সে তো একথা শ্রবণ করবেই। বাকিরাও যদি শ্রবণ করে এবং অন্তবের মধ্যে গ্রহণ করে তবে তারা নিশ্চয়ই অনেকখানি এগিয়ে যাবে এতে কোনো সন্দেহ নেই।

খুব বেশী বিস্তারের মধ্যে আমরা যাব না। আমরা বলি অথবা এখানে আমি বলছি, তোমরা শোনো।

আমি বলছি মানেই আমরা বলছি কিন্তু। আমার পিছনে যে অনেক লোক দাঁড়িয়ে আছে। তাদের সকলকে নিয়েই কথা বলছি।

দেবদেবী অনেক আছেন। হয়তো অসংখ্য আছেন। থাকুন না। তাঁরা সকলেই সেই একজনের বিচিত্র বিলাস। সেই সম্বন্ধে কোনো কথাই ওঠে না। কিন্তু তুমি এগিয়ে চলেছ অপার শান্তি এবং অন্তহীন আনন্দের দিকে। ওই দিকেই তোমার লক্ষ্য। তুমি তেমন জীবন যাপন করছ। সেই জীবন আশ্চর্য জীবন। এই জীবন সংসারের ধারার জীবন নয়। এই জীবন এমন একটা জীবন যে-জীবন তোমাকে পৌঁছে দেবে অনাদি অনন্ত পূর্ণের কোলে। একেবারে খণ্ডের থেকে অখণ্ডে নিয়ে যাবে এই জীবন।

হে মানুষ, তোমাদের মধ্যে যে-কেউ একটা সিংহাসন পাতবে ধ্যান ধারণা পূজার জন্যে তার মনে রাখতে হবে সেই সিংহাসনটি হওয়া চাই যতদূর সম্ভব সুন্দর, পরিচ্ছন্ন এবং আনন্দদায়ক। তোমার পূজার সিংহাসনের কথা বলছি কিন্তু। ছোট্ট একটি সিংহাসন করলেও হবে। তোমার সামর্থ্য অনুসারে তুমি করবে। সেই সিংহাসনে অবান্তর কোনো ছবি ইত্যাদি রাখবেই না। অবান্তর ছবি না, অবান্তর মূর্তি না, অবান্তর কোনো কিছুই না। সেই সিংহাসনে থাকবেন তোমার গুরু এবং তোমার ইষ্ট দেবতা। কখনো কারও পক্ষে এমনও হ'তে পারে যে, গুরুই সমস্ত। ইষ্ট দেবতা আলাদা ক'রে আর নেই। ইষ্ট দেবতা থাকলে গুরুর মধ্যেই আছেন।

সেইখানে সিংহাসনে একজন, শুধু একজন। সেই সিংহাসনের সামনে ব'সে তুমি প্রতিনিয়ত প্রকৃত সাধন ভজন অভ্যাস করতে থাক।

যদি কারও ইচ্ছা হয় ঘরের অথবা মন্দিরের দেওয়ালেতে যত ইচ্ছা ছবি সাজাও। যে কোনো দেব অথবা যে কোনো দেবী। কিন্তু সিংহাসনে নয়। সিংহাসনে রাখবে নিজের উপাসনার বস্তু।

আর একটি কথা মনে উদিত হচ্ছে। সেটাও এখানে ব'লে যাই। মন্দিরের অথবা বাড়ির দেওয়ালে হোক বা-যেখানেই হোক ছবি রাখতে হয় মহাপুরুষগণের। দেবদেবীর ছবি অথবা ওই জাতীয় দৃশ্যসমূহ না রেখে মহাপুরুষ অথবা উন্নত জীবনকে চোখের সামনে রাখলে ভাল হয়। এতে ক'রে তোমার জীবন ধাক্কা খাবে এবং হয়তো বা জেগে উঠবে। যাদের কখনো দেখনি, যাদের কথা শুধু কল্পনা ক'রে আসছ তোমার দেওয়ালে তাদের ভিড় বাড়িয়ে লাভ কি। সত্য হোক বা না হোক তুমি তাদের থেকে একটু দূরে থেকো না।

এ জগতে তো কতই কিছু আছে। তুমি কি সকলের সঙ্গেই সম্পর্ক রাখ। সম্পর্ক রাখতে হয় সমস্তের সঙ্গেই। কিন্তু আলাদা আলাদা ক'রে নয়, মুলের দিক দিয়ে। সমস্তকেই তুমি আপন ক'রে গ্রহণ কর। সেই সমস্তের মধ্যে আছেন পূর্ণ, পরম অনাদি অন্তহীন। বেশ ভাল ক'রে বুঝে

নিও কথাটা।

এবারে পরিশেষে বলি—তোমার ঘরের সীমার মধ্যে সাধন ভজনের স্থানেতে রাখবে কেবল তাঁকে যাঁকে দেখলে সেই চরম একান্ত আপনের কথা মনে প'ড়ে যায়। অন্য বস্তুকেই আমি অবান্তর বলছি।

এইখানেই আমি এই প্রসঙ্গ এখনকার মত শেষ করলাম।

পরিচ্ছেদ—৯

ব্যাপারখানা এই, আমার ভাষাতে আমি বলি, আমি দেখতে পেয়েছি। আমার মতন ক'রে আমি দেখতে পেয়েছি। আমি দেখেছি যে, সেই একজন আছেন। নানান ছাঁদে, নানান ভাবে, নানান কায়দায়, নানান বেশে, নানান ঢঙে। আলোকে আলোকে, লোকে লোকে তিনি বিচ্ছুরিত এবং বিস্তারিত। ছন্দে ছন্দে তিনি উদ্বেলিত। ভাবে ভাবে তিনি সম্ভাবিত এবং উদ্ভাবিত। যোগে যোগে তিনি যুক্ত। রসে রসে তিনি রসময়। আবেগে আবেগে তিনি নিয়ত আবিষ্ট। বেগে বেগে তিনি গতিশীল।

তাঁর কথা কি আর বলব। অন্তরে অন্তরে তিনি অত্যন্ত আন্তরিক, নিতান্ত ঐকান্তিক। উপরে উপরে যেমন তিনি মেঘের মত ভাসমান, তলায় তলায় তেমন তিনি একেবারে অতলান্তিক। তিনি হচ্ছেন এ হেন তিনি।

তাঁর কথা বলছিলুম। তাঁর কথা ব'লে আমার সাধ মেটে না। যেমন একটা গান লিখেছি—মা ব'লে মোর সাধ মেটে না—সেইরকম তাঁর কথা ব'লে আমার সাধ মেটে না। ইচ্ছা হয় আমি কেবল বলি। বলি আর বলি।

সেই বস্তু দুই, চার, ছয় এরকম নয়। দশ, বিশ, পঞ্চাশ তাও নয়। দুশো, পাঁচশো তাও নয়। হাজার, লক্ষ, কোটি সে কথাও খাটে না। কোনো কথাই যে খাটছে না। কোনো ভাষাই যে সেখানে পৌঁছয় না। কিছুতেই কিছু হয় না।

কিন্তু তবু সকল ছাপিয়ে এই কথাটা আমার কাছে খুব উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, তিনি সবচেয়ে বেশী ক'রে আছেন। সবথেকে প্রকাশ তাঁর। আশ্চর্য প্রকাশ। আবার যেমন বিকাশ তেমন প্রকাশ।

ওই বিকাশটুকু লক্ষ্য করবার মত জিনিস। ওই বিকাশে একটা ক্রম রয়েছে। ক্রম রয়েছে তাই ধারাও রয়েছে। বিশ্ব-জগতের এই ধারা। এই ধারাতে বিশ্ব জগৎ যেন প্রবাহিত হচ্ছে। কোথায় যে ব'য়ে চলেছে সে-কথা কে বলবে।

এই যে ধারা, এই ধারাই কিন্তু সময়ের ধারা। কালের এই ধারা। যদি বল বলতে পার, মা কালী এই ধারাতে নৃত্যশীলা। এই ধারাও কোনো দিন বন্ধ হবে না, মা কালীর নৃত্যও থেমে যাবে না।

এই জগতে থাকাটাই আমার মায়ের নাচ। জগৎ আছে মানেই মা নাচছেন। এই বিশ্ব বৈচিত্র্যটাই সেই একজনের লীলাবিলাস। তাঁকেই আমি মা বলেছি। আবার তাঁকেই আমি বলছি সেই একজন।

তাঁকে যে আমি দেখতে পেয়েছি। সেই একজনকে আমি নিয়ত দেখি। সকলেই হয়তো নিয়ত দেখে। আমিও নিয়ত দেখি। কিন্তু নিয়ত দেখলে কি হবে। আমি সবসময়ে সচেতন থাকি না। সমস্ত কাণ্ডটাই কিন্তু সেই তাঁর, তাঁকে তুমি যা ইচ্ছে বল বলতে পার।

পরিচ্ছেদ—১০

আমার জীবন-কথা ব'লে যাচ্ছি। তাই ছেলেবেলাকার একটি কাহিনীতে প্রবেশ করি। ছেলেবেলায় পি. এম. বাগচীর বাড়ীর সন্নিকটে ১১ নম্বর বাড়ীতে নীচেকার ঘরে—যাকে বলে বৈঠকখানা—সেই ঘরে ব'সে আছি। এমন সময় কানে গেল, একটা ছেলে বলতে বলতে যাচ্ছে—আমি ধার ধারি না। আমার পরিচিত ছেলে। ছেলেটির বয়স আঠারো কুড়ি। আমাদের পাড়ার ময়রা বাড়ীর ছেলে। ময়রা বাড়ী শব্দটা বলতে আমার ভাল লাগে না। কিন্তু আমাদের বাড়ীতে সবাইকার মুখে শুনতুম, ওই বাড়ীটা ময়রা বাড়ী। তাই ওই নামটাই বললাম।

ওই বাড়ীর একটা ছেলে রাস্তা দিয়ে বলতে বলতে যাচ্ছে, আমি ধার ধারি না। ঘরে ব'সে আমি শুনতে পেলাম। আমার বয়স তখন পাঁচ ছয় সাত এরকম একটা কিছু।

ভাষাটা অর্থাৎ কি না শব্দটা আমার মধ্যে কোনো একটা জায়গাতে কি রকম একটা ঝংকার তুলত। এখন যে-রকম বলছি এবং ভাবছি, সেরকম নয় কিন্তু। সেই শিশু-মনের কোনো এক কোণে একটা বিশেষ স্পন্দন অনুভব করেছিলাম। চেতনার মধ্যে একটা স্থানে যেন একটা সুর বেজেছিল। সেই সুর প্রচলিত সুরের মত নয়। অন্য এক রকমের সুর।

এই যে কথাটাকে আলাদা ক'রে বুঝতে পারা এই জিনিসটা তখন সেই বয়সেই আমার জীবনে ঘ'টে গিয়েছিল। আমার অনুভূতির মধ্যে একটা অপ্রচলিত জিনিস যেন ধরা পড়েছিল। এখনও আমার মনে আছে কি ক'রে। মনে না থাকলে লেখাচ্ছি কি ক'রে। সমস্তটাই একখণ্ড আশ্চর্য বস্তু, নয় কি।

পরিচ্ছেদ—১১

এবার আর এক গল্পে চ'লে যাচ্ছি। জীবনটাইতো একটা মস্ত বড় গল্প। মস্ত বড় গল্পের মধ্যে অনেক অনেক ছোট ছোট কাহিনী। গল্পের পর গল্প জুড়ে একটা মস্ত বড় গল্প তৈরি হয়েছে। সেই গল্পটাই হ'ল আমার জীবন-কথা।

কিছু পরবর্তীকালে—আমার বয়স তখন চল্লিশের আশেপাশে—আমি অনেক জায়গায় ঘুরে বেড়াতাম। আজ এখানে, কাল সেখানে। খুব লম্বা একটা সময় বড় বেশি কোথাও থাকতাম না।

একবার টাকির কাছাকাছি চ'লে গেলাম। বহরমপুরে আমার একটি মাসীমা থাকতেন। মাসীমা নয়, মাসীমা ব'লে ডাকতুম। যে সমস্ত বয়স্ক মহিলা অদ্ভুত ভালবাসা নিয়ে আমার জীবনে এসে গেছেন তিনি তাদের মধ্যে একজন। আশ্চর্য চরিত্র এই মাসীমার ছিল। আমি যখন এঁকে দেখতে পেয়েছি তখন ইনি বিধবা। এঁর এক ছোট বোন ছিল। তিনিও বিধবা। তিনি থাকতেন টাকির কাছে কি যেন একটা গ্রামে। আমি তাঁরই বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলাম। জায়গাটার নাম কিছুই আমার মনে নেই। তবে সেই জায়গা অজ পাড়া গাঁ। বসিরহাট হয়ে যেতে হয়। দুই তিনবার গিয়েছিলুম কলিকাতার থেকে। আমার মনে পড়ছে লঞ্চে ক'রে যেতে হ'ত ইছামতী নদীর ওপর দিয়ে। সেই গ্রামে বা আশেপাশে দুটো একটা সভাও করেছিলাম। গ্রামে গ্রামে যেতুম আর সভা করতুম। সেই ছোট মাসীমার বাড়ীর একটি ছেলের সঙ্গেও আলাপ হয়েছিল। একবার সেই ছেলেটি মানে সেই যুবকটি কলিকাতায় এসে আমার কাছে

ঠিক করলে, তাদের গ্রামের সন্নিকটে টাকিতে একটি সভা করতে পারা যাবে। রামকৃষ্ণ মিশনের লোক তারা যারা সভা করবে। আমি উৎসাহিত হলুম। আমাদের গ্রুপের মধ্যে মেয়েরাই বেশী। আমি সেই কথা বললুম। আমার সেই ছোক্‌রা বন্ধুটি বললে, আমি সেখানে যাই তারপরে এসে আপনাকে খবর দেব তারা কতদূর কি করতে রাজী হবে।

হা ভগবান। মজার কথা এই, সেই ছেলেটি এসে খবর দিল, তারা রাজী নয়। মেয়েদের সঙ্গে এক প্ল্যাটফর্মে গান গাওয়া তাদের না কি রীতি বিরুদ্ধ। এটা নীতি বিরুদ্ধ না রীতি বিরুদ্ধ তা বুঝতে পারি না। আমি শুনেছি গোলপার্কের কাছে বিরাট বড় বাড়ীটাতে নাম করা কোনও মেয়েও গান গেয়েছে। তা ছাড়া সর্বজনমান্য নিবেদিতা স্বামী বিবেকানন্দেব পাশে থেকে কত কাজ করতেন। আরও কত কি। সে যা হোক। আমাদের সভাপর্ব অর্থাৎ টাকির সভাপর্ব সেইখানেই শেষ।

মাঝে মাঝেই আমি কলিকাতার থেকে বাইরে চ'লে যেতাম। পববর্তীকালে—যখন আনন্দময়ীমার কাছ থেকে চ'লে এসেছি তখনকার কথা বলছি কিন্তু। প্রথম দিকে দিল্লীতে বছর তিনেক ছিলাম। তারপরে কলিকাতায় এসে উঠলাম মাতা আনন্দময়ীর আশ্রমে। দক্ষিণ কলিকাতায় একডালিয়া রোডে। তারপরে বাসা নিলুম পাম্ এভিনিউতে। বালিগঞ্জ ফাঁড়ির কাছাকাছি ব্রড ষ্ট্রীট অঞ্চলে। সেই সময়টাতে ওই দিকে মুসলমানই বেশী থাকতেন। একটি ছোট্ট বাড়ীতে আমরা দু তিন ঘর থাকতাম। সেই বাড়ীতেই অনন্তা প্রথম আমার কাছে গিয়েছিল গান শেখার উপলক্ষ্যে। ও বাড়ীতে আমার বেশী দিন থাকা হয় নি। কয়েক মাসের পরেই চ'লে আসি বালিগঞ্জ গার্ডেনসে রাঙা মায়ের বাড়ীতে। রাঙা মায়ের বাড়ীতে থাকতেই আমার আলাপ হয় মহেন্দ্রবাবুর সঙ্গে।

একডালিয়া রোডে তখন মাতা আনন্দময়ীর আশ্রম। সেইখানেতে আমি গীতার ব্যাখ্যা করতুম সপ্তাহে একটা দিন অথবা দুটো দিন। পরবর্তীকালে আনন্দময়ী আশ্রম উঠে যায় আগরপাড়ায়। আগরপাড়ায় যাওয়ার পূর্বে একডালিয়া রোডে ওই আশ্রমটি ক'রে দিয়েছিলেন মনোরঞ্জন সরকার মহাশয় এবং আরও কেউ কেউ।

মনোরঞ্জনদার একটা ইতিহাস আছে। আমি যখন একবার মা আনন্দময়ীকে নিয়ে একলা ঘুরছিলাম তখন হাওড়াতে মনোরঞ্জনদার সঙ্গে দেখা হয়। মহাপ্রভুর একটি মন্দিরে আমরা দু চারজন ছিলাম। মনে পড়ছে সেই মন্দিরের বিগ্রহ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কাঁদছেন। কাঁদা-বদন বিগ্রহ। এই মন্দিরে—মন্দিরের অঙ্গনে নদের নিমাই অভিনয় হয়েছিল। হাওড়ার বিখ্যাত নদের নিমাই। সেই যুগে এই অভিনয়টি চারদিকে খুব প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। অভিনয়ের গানগুলিও। একটা গান—সেদিন যেমন এসেছিলে হরি।

মনোরঞ্জনদা ক্রমে ক্রমে আমাদের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত হয়ে পড়লেন। পরবর্তীকালে কলিকাতায় এবং নবদ্বীপে তিনি আনন্দময়ী মায়ের খুব কাছাকাছি এসে পড়েছিলেন। কিন্তু আবার তিনি পরে স'রে গেলেন। আমার কিন্তু মনোরঞ্জনদার কথা খুব মনে পড়ে। তাঁর জীবন সাধারণ পাঁচজনের মতোই ছিল। কিন্তু তাঁর হৃদয়টি ছিল ভক্তহৃদয়।

আমার জীবনে নবদ্বীপধাম অনেকবার অনেকখানি জায়গা অধিকার করেছে। একেবারে বালককালে ঠাকুরদাদা প্রভৃতির সঙ্গে নবদ্বীপে গিয়েছিলাম। আমার ঠাকুরদাদাকে আমি দাদা বলতাম। নবদ্বীপে দাদা আমাকে গঙ্গাতে সাঁতার শিখিয়েছিলেন। সেই অল্প বয়সে দাদার সাহায্যে এবং যত্নে আমি যখন প্রথম জলে ভাসতে শিখলুম তখন একটা আশ্চর্য আস্বাদন যেন আমার জীবনকে স্পর্শ করল।

নবদ্বীপে সেইসময় আরও কত কাহিনী। আমি তখন শুধু একটু একটু খেয়াল শিখেছি। খেয়াল মানে খেয়াল গান। একটা জায়গায়

নবদ্বীপে ছেলেরা খেয়াল গানের চর্চা করত। আমি কি রকম ভাবে যেন তাদের সঙ্গে কিছুটা যুক্ত হয়ে পড়লাম। একদিন একটা ছোট্ট ঘরোয়া সভাতে ছোট খেয়ালের একখানা গান ধরেছি। সম্ভবতঃ ইমনকল্যাণ। গান গাইছি কিন্তু আমার অজ্ঞাতসারে লয়টা বেড়ে যাচ্ছে। একজন তবলা বাজাচ্ছিলেন, তাঁর হ'ল বেগতিক অবস্থা। আমি যে বেড়ে যাচ্ছি সে কথা আমি কিন্তু জানি না। ওঁদের মধ্যে কে একজন আমার ভুলটা ধরিয়ে দিলেন। আমার পক্ষে সে বেশ ভালোই হ'ল। আমি বুঝতে শিখলুম আমার আর একটু সংযত হয়ে গাওয়া উচিত। একরকম শিশুকালের কথা। কিন্তু আমার মনে ছাপ দিয়েছিল খুব জোর।

নবদ্বীপে আমার এক ভগ্নীপতিও গিয়েছিলেন। এখনও আমার ছবিটা মনে পড়ে, দোতলার ঘরে আমার সেই ভগ্নীপতি অর্থাৎ আমার পিসতুত বোনের স্বামী শ্রীসুধীরচন্দ্র চক্রবর্তী গান ধরেছেন—যমুনে এই কি তুমি সেই যমুনা প্রবাহিনী।

এই সুধীরবাবুর সঙ্গে আমার শৈশবের কিয়দংশ ভালমতই জড়িয়ে গিয়েছিল। আমি হয়তো পূর্বে উল্লেখ করেছি, আমাদের বাড়ীতে আত্মীয়-স্বজন এসে কত কতবার, কত কতদিন অথবা কত কতমাস কিংবা কত কত বৎসর থাকতেন এর কোনো হিসেব নিকেশ নেই। আমরা সবাই থাকতুম যেন একটি পরিবারের লোক।

নবদ্বীপে পোড়া মা তলা প্রভৃতির কথা আমরা তখনই বেশ শুনেছিলাম। একটি কথা আমার বেশ মনে পড়ে—শুধু সে সময়ে নয়, পরবর্তীকালেও আমরা ভেবেছি—ওখানে শুধু বৈষ্ণবরা বাস করতেন। তা নয়। যেমন বৈষ্ণব অনেক থাকতেন, তেমন শাক্ত সম্প্রদায়ের বহুতর মানুষ ওই স্থানে বাস করতেন। মনে পড়ছে, কী একটা উৎসবে বিরাট শোভাযাত্রা হ'ত। অগণিতজনের সমাবেশ। বড় বড় মূর্তি নিয়ে মিছিল বেরুত। যা অস্পষ্ট মনে পড়ছে তার থেকে বলছি কিন্তু। এখন কি রকম হয়ে গেছে কে জানে।

নবদ্বীপে যেতাম আমরা সমাজ-বাড়ি। ললিতা সখী তখন সেখানে থাকতেন। তিনি আবার সম্পর্কে আমার কিছু হ'তেন মামার বাড়ির দিক দিয়ে। সে যাক। আমি সেই সময়ে ললিতা সখীর কীর্তন শুনেছিলাম। নিজে তিনি গাইতেন। সমাজ-বাড়ির জনসভায় তিনি গান ধ'রেছেন, আমার একটু একটু যেন মনে পড়ে।

কলিকাতায় এসে গেলাম। আমার বড় বোন—মঞ্জুর মা তখন শ্বশুর বাড়িতে। তিনিও চিঠি লিখতেন, আমিও চিঠি লিখতাম। তাঁকে আমি লিখছি, আমি নবদ্বীপে গিয়ে সাঁতার শিখে এসেছি। সেইকালে সাঁতার শেখা আমার জীবনের একটা মস্ত বড় ঘটনা।

সুধীর চক্রবর্তী মহাশয় আমাদের বাড়ীতে সুদীর্ঘকাল ছিলেন। বেশ কয়েক বছর। আমায় লেখাপড়া শেখানোর ভারটা তাঁর উপরেই ন্যস্ত হয়েছিল কিছু কাল।

শৈশবের কোমল দিবসগুলো তাঁর কাছেই অনেকটা কেটেছে। এখন তিনি কোথায় আছেন এবং কেমন আছেন সে-কথা বলতে পারি না। কিন্তু তাঁর কথা বেশ ভালভাবেই মনে আছে। তাঁর কথা উল্লেখ না ক'রে পারলাম না।

পরিচ্ছেদ—১২

এই গেল বাল্যকালের কথা। তারপরে আর একবার নবদ্বীপে গিয়ে বেশ কিছুদিন ছিলাম। সে বার মাতা আনন্দময়ীর সঙ্গে। সেই ঘটনা বেশ মজার ঘটনা।

তখন আমি মায়ের সঙ্গে থাকি। মায়ের সঙ্গে আরও থাকেন রুমা দেবী ইত্যাদি। রুমা দেবীকে এবং আমাকে নিয়ে মা বেরিয়ে পড়লেন। একেবারে নবদ্বীপ। রেল ইষ্টিশনে আমরা নেমে একখানা ঘোড়ার গাড়ি

ভাড়া করলাম। ঘোড়ার গাড়ি না ব'লে ছ্যাক্‌রা গাড়ি বলাই ভাল। মা গাড়িতে উঠে বসেছেন একটা ঘোমটা দিয়ে। মায়ের তো ভারতবর্ষব্যাপী খ্যাতি। কেউ চিনে ফেললেই মুশকিল হবে। মা গাড়িতে উঠে বসেছেন। এমন সময় একটি বিধবা গোছের মহিলা মাকে কি রকম ক'রে দেখতে পেয়ে ব'লে উঠলেন, 'ওমা এ যে আনন্দময়ী মা দেখছি।'

আমরা কিছুটা হতবাক্। ওরে চল্, চল্, গাড়ি ছেড়ে দে। গাড়ি তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলল। তক্ষুণি মায়ের গাড়ি সেই মহিলার নাগালের বাইরে চ'লে গেল।

আমার আর বেশী কিছু মনে নেই। নবদ্বীপের লোকালয় অঞ্চল ছাড়িয়ে আমরা চ'লে গেলাম একেবারে একটা প্রান্তে—নবদ্বীপেরই একটা প্রান্তে গঙ্গার ধারে।

গঙ্গার একেবারে ধারে—যেখানে মাঝিদের ছোটো ছোটো নৌকো বাঁধা থাকে সেইখানে।

তারপরে আমরা দুখানি ছোটো ছোটো নৌকো—ছইওয়ালা নৌকো ভাড়া করলাম। মায়ের সঙ্গে আমরা তখন দুজন। আমি আর সেই রুমা দেবী।

রুমা দেবীর পরিচয় একটু না দিলেই নয়। রুমা দেবীর কথা অনেক কথা। রুমা দেবী পাহাড়ী মেয়ে। আপন বাড়ী তাঁর গাড়বিয়ং—কৈলাসের অল্প কিছু নীচের দিকে। রুমা দেবীর ছবি বেরিয়েছিল প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়ের একখানি বইতে। শিল্পী প্রমোদকুমারের হাতে আঁকা ছবি। একবার প্রমোদকুমার মাতা আনন্দময়ীকে দেখতে এলেন কাশীধামে। রুমা দেবীর সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা এবং আলোচনা হ'ল। তাঁদের দেখা হয়েছিল সেই গাড়বিয়ং-এ কৈলাসের কাছে। এই তাঁদের আবার দেখা সাক্ষাৎ।

আমি তখন মায়ের সঙ্গে ঘুরছি। মায়ের সঙ্গে ঘুরেছি সাড়ে সাতটা বৎসর প্রায় একটানা। আমি মায়ের কাছে আসবার ঠিক আগেই

মা গিয়েছিলেন কৈলাসে। কৈলাস যাওয়া এক বিরাট ব্যাপার। হুলুস থুলুস কাণ্ড। সেই যুগের কৈলাস যাওয়া—এটা যেন মনে থাকে। মা কৈলাস গিয়েছিলেন ১৯৩৭ সালে অথবা কাছাকাছি কোনো সময়ে।

মা যখন পাহাড় থেকে নেমে এলেন সঙ্গে এলেন এই রুমাজী। ছোট্ট-খাট্ট মানুষটি গৈরিক বসন পরা। কিন্তু অত্যন্ত কর্মঠ। মায়ের জন্য রুটি তৈরি করতেন—সেবাকার্যে বড়ই তৎপর।

একবার কিষাণপুর আশ্রমে ঘটল বিপর্যয়। রান্নাঘরের দিকে লম্বা বারান্দায় সবাই খেতে বসেছেন। রুমা দেবীও এক পাশে বসেছেন। আর একটা দিকে খেতে বসেছেন দিদিমা অর্থাৎ মায়ের মা। খাওয়া চলেছে। একজন মায়ের কাছে গিয়ে জানিয়ে দিলে রুমা দেবীর সঙ্গে এক লাইনে ব'সে খাওয়াটা দিদিমার পক্ষে অনুচিত। কেননা রুমা দেবী আচারে আচরণে না কি পাহাড়ে বেচাল এবং সেই কারণে রক্ষণশীল হিন্দু পন্থায় অচল।

এইসব আলোচনা ফিসফাস হ'তে লাগল। দিদিমাকে একজন গিয়ে বললে, উঠে এসো। এই লাইনেতে তোমার খাওয়াটা সাজে না।

দিদিমা উঠতে রাজী হলেন না। মায়ের দিক থেকে কথাটা এসেছিল, তবুও না। দিদিমার সাধারণ জ্ঞান অত্যন্ত বেশী। তিনি অচঞ্চল। তাঁর এই অচঞ্চল ব্যবহার আমাদের করল বিস্ময়াবিষ্ট এবং আনন্দিত।

রুমা দেবী শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীর কাছে দীক্ষিত। আবার পরে আমাদের মা আনন্দময়ীর কাছ থেকে গেরুয়া বসন নিয়েছিলেন। এবং সেই হিসাবে সন্ন্যাস অবলম্বন করেছিলেন। তাঁর ছিল বহু গুণ। হিন্দি ভাষায় লিখতেও তিনি পারতেন। তাঁর নিজের অনুভূতির কথা তিনি লিখে রেখেছিলেন কিছুটা। বেশ কয়েক পৃষ্ঠা হবে। আমার যেন মনে পড়ে, আমিই তাঁকে লিখতে বলেছিলুম। লিখে তিনি আমার হাতে দিয়েও ছিলেন। সাধনার পথে কি রকম কি হয়েছিল সে সব কথা। সেই কাগজ আমার কাছে দীর্ঘকাল ছিল। তারপরে কোন্ সময়ে কোথায় যে

হারিয়ে গেছে তা আর আমি এখন বলতে পারি না। সেই কাগজগুলি থাকলে এখন আমি সেইগুলিকে আদর করতাম। কিন্তু মধ্যে আমার যে রকম মানসিক অবস্থায় দিন কাটছিল তাতে ওগুলোকে ঠিকমত রেখে দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না।

রুমা দেবীর কথা বলতে গেলে অনেক কথাই আসে। আমি আর বেশী বিস্তারে যাব না। শুধু এইটুকু বলছি, আমার জীবনের এক অংশে রুমা দেবীজীর সঙ্গে আমার হয়েছিল একটা গভীর যোগাযোগ। সবাই তাঁকে দেবীজী ব'লে ডাকত। আমার জীবনের কোনো এক স্থানে দেবীজীর আসনটা ছিল কোমল আসন। মনে পড়ে আমাকে দেবীজী ডাকতেন অভয়-অ ব'লে। শেষের অ-কারটাকে একটু বিলম্বিত ক'রে। আমার ভারী মিষ্টি লাগত।

পরিচ্ছেদ—১৩

এবার এক কথা থেকে আর এক কথায় চ'লে আসি। ফিরে যাই বাচ্চা বয়সে। সেই গুলু ওস্তাগর লেনের বাড়ী। সেই বোনেদের সঙ্গে তাদের ইস্কুলে যাওয়া। বোন মানে এখানে পিসতুতো দিদি প্রভৃতি। আমাকে সঙ্গে ক'রে ইস্কুলে নিয়ে গিয়ে একপাশে বসিয়ে রাখত। আমি ব'সে ব'সে সব দেখতাম, সব শুনতাম।

মেয়েরা গাইত, দেবী সুরেশ্বরি ভগবতী গঙ্গে আরও অনেক কিছু। আবার গাইত, প্রভুমীশমনীশমশেষ গুণম্ ইত্যাদি শিবের স্তব। এখনও যেন আমার সামনে এইগুলো ভেসে উঠছে।

একটা স্মৃতি আসে, কানাইয়ের দোকান। কানাই ব'লে একটি লোক একদিকে একটি দোকান করত। আমি সেই দোকানে গিয়ে প্রায়ই এটা, ওটা কিনতাম। কখনও সেন্‌সেন্, কখনও কাঁচের কলম, কখনও কারও

জন্যে নস্যি, আবার কখনও ছোট্ট এক শিশি গায়ে মাখবার ক্রীম। ক্রীমের শিশির দাম ছিল দু পয়সা ক'রে। আরও কত কি জিনিস।

কানাই লোকটার কথা একটুখানি বলি। বিপুল শরীর ছিল তার। থল্‌থলে মেদবহুল দেহ। জামা গায়ে বড় একটা দেখতাম না। মাঝে মাঝে রাস্তা দিয়ে আসছে দেখতাম, বিরাট একটা বস্তা পিঠে ঝুলিয়ে। সেই বস্তার মধ্যে রইত হরেক রকম জিনিস — তার দোকানের সামগ্রী। দূরবর্তী কোনো এক বাজারে গিয়ে কেনাকাটা ক'রে সে বেচারী মালটাকে কাঁধেই নিয়ে আসত মনে হয়। এই ছিল আমাদের কানাই। কানাই-এর দোকানের পাশ দিয়ে যে গলি চ'লে গেছে সেই গলি দিয়ে গেলে পেতাম কোম্পানীর বাগান, যার নাম ছিল ব্ল্যাকওয়ার স্কোয়ার। আমরা শুনতাম এবং বলতাম, কোম্পানীর বাগান। প্রায়ই আমরা সেই বাগানে বেড়াতে যেতাম। অথবা হৈ হৈ করতাম।

কানাই কোথায় চ'লে গেছে জানি না - কানাই বেঁচে আছে কি না তাও জানি না — সম্ভবতঃ সে আছে পরপারে। সে সব কথা অনেক কথা। তারমধ্যে কতকটা প্রায় ভুলেই গেছি। তবু তার চিত্রটি এখন পর্যন্ত মনের আয়নায় ভেসে ওঠে।

এরপর আর এক কথায় যাচ্ছি। গুলু ওস্তাগর লেনের ওই বাড়ীতে বাবার ঘরটি ছিল একেবারে দক্ষিণ দিকের শেষ ঘর। সেই ঘরের দক্ষিণ দিকে আবার একটা জানালা ছিল। সেই জানালা দিয়ে অনেক সময় হু হু ক'রে হাওয়া আসত।

জানালা খুললেই সামনেই হরিবোলাদের বাড়ী। লোকটা হয়তো সবসময় হরি বোল হরি বোল করত। সবাই বলত হরিবোলাদের বাড়ী। এই বাড়ীর কথা আমি আগেই উল্লেখ করেছি।

দক্ষিণ দিকের এই ঘরটিতে বাবার খাটের উপর সন্ধ্যারাত্রে কম্‌লী ব'লে আমার সেজদি আমাকে নিয়ে ঘুম পাড়াত। সেই সময়ে প্রায় রোজই এই চলত। সেজদি অর্থাৎ কম্‌লীর কাছে আমি সুবোধ বালকের

মত শান্ত হয়ে থাকতুম।

জীবনটা যেন একটা মালা। অনেক ফুলে গাঁথা সেই মালা। কোনো ফুলে খুব চমৎকার গন্ধ। কোনো ফুলে গন্ধ নেই, কেবল দেখতে বাহার। সব মিলিয়ে জীবনটা এক বিচিত্র মালা।

অথবা জীবনখানা যেন একখানা বই। সে বইতে অনেক অধ্যায়। অধ্যায়ে অধ্যায়ে কত-না কাহিনী।

আবার ভাবি, আমার জীবন যেন একটি নদী। নদীতে কলকল তান তুলে প্রবাহ চলেছে। ধারা গিয়ে পড়ছে না জানি কোন্ সে সাগরে।

আবার বলতে শুরু করি। ঠিক ধারাবাহিক কাহিনী নয় কিন্তু। যখন যে কথা মনে পড়ে লেখা হচ্ছে। মাতা আনন্দময়ীর পর্যায় শেষ হয়ে গেল। শেষ হয়ে গেছে অনেকদিন। কলিকাতায় এবং আশেপাশে আমি যত্রতত্র ঘুরে বেড়াচ্ছি। নতুন জায়গায় সুবিধা পেলে চ'লে যাই।

একবার একটি মহিলার কাছে খবর পেলাম গঙ্গার ওপারে উলুবেড়ের দিকে তাদের বাড়ী। সেই মহিলা কিন্তু একটি সাধারণ মত কাজ করা মেয়ে। তার কথা মত আমি চ'লে গেলুম গঙ্গার ওপারে। ইচ্ছেটা এই, স্থানে স্থানে গীতার ব্যাখ্যা করব অথবা বক্তৃতা দেব। মূল কথাটা ধর্ম প্রচার ক'রে বেড়াব।

বজবজে গিয়ে একটা লঞ্চে উঠলাম। গঙ্গার ওপারে নামলাম। নতুন জায়গা। কি ক'রে কি ক'রে যেন একটা সূত্র ধ'রে গঙ্গার ওপারে জমিয়ে নিলাম। গীতার প্রসঙ্গ অথবা ঈশ্বরের প্রসঙ্গ অনুষ্ঠিত হ'ল। এইভাবে কলিকাতার থেকে এ যাত্রায় একবার কি দুবার আমি ওই অঞ্চলে ঘুরেছিলাম। উলুবেড়ে নামক স্থানেও যেন গিয়েছিলাম মনে পড়ে।

এইভাবে কত কত ঘুরেছি। একবার গিয়েছিলাম ঝাকরদা না মাকরদা এর মধ্যে একটা জায়গায়। এও গঙ্গার ওপারে।

পরিচ্ছেদ—১৪

একবার বাস করছি কোডারমা অঞ্চলে। স্থান ঝুম্‌রিতিলাইয়া। মাঠ আর মাঠ। উঁচু ছোট পাহাড়ও দেখতে পাওয়া যায়। যাঁর বাড়ীতে আছি তাঁর নাম শ্রীযুক্ত ············ বিশ্বাস। বাঙালী, কিন্তু অনেক দিন ধ'রে ওই দেশে বাস করছেন। দীক্ষা নিয়েছেন আমার কাছে। প্রকৃতিটা কিন্তু এক অদ্ভুত ধরনের। গুরুকে কিছু—এমন কি সামান্য কিছু টাকা পয়সা পাঠালেও দশ বার ক'রে জিজ্ঞেস করবে টাকাটা ঠিকমত পৌঁছেছে কি না, টাকাটা ঠিকমত পেয়েছেন কি না। আমার কাছে যাঁরা থাকেন তাঁদের উপর আস্থা নেই। যদি তাঁরা টাকাটা মেরে দেয় এইরকম একটা মনের ভাব।

ঝুম্‌রিতিলাইয়াতে তাদের বাড়ী দু তিন বার গিয়ে আমি ছিলাম। কিন্তু মনটা আমার তেমন প্রসন্ন থাকত না সেই বাড়ীতে। একটা কারণে নয়, অনেক কারণে। ভদ্রলোকের ছোট ছেলের সঙ্গে খিটিমিটি লেগেই থাকত। সেই ছোট ছেলে এক পাল ছাগল নিয়ে সর্বদা থাকত ব্যস্ত। ছাগল পোষা ছিল তার hobby.

ঝুম্‌রিতিলাইয়া কিন্তু খুব সুন্দর একটা জায়গা। যাকে বলা হয় মনোরম জায়গা। একদিকে সুন্দর একটা পাহাড় মাথা তুলে রয়েছে। সেই পাহাড়ে একদিন বেড়াতেও গিয়েছি। পাহাড়ের উপরে এক সাধু থাকেন। বংশীবাবু—আমার বংশীবাবা একদিন সেই সাধুর কাছে গিয়ে চা খেয়ে এসেছিলেন। আমাকে তখন চিঠি লিখেছিলেন, আমি পাহাড়ে গিয়ে সাধুর কাছে উপস্থিত হয়েছিলাম। সাধুবাবা আমাকে চা না খাইয়ে ছাড়ল না। এইটাই ছিল তার অবেস। এই অবেস কথাটিতে আমি খুব একটু মজা পেয়েছিলাম। আমি একটা গল্প পেয়েছিলাম। সে গল্পটা

এইরকমঃ একজন বলেছিল, রোজ সকালে উঠে আমার দুটো সন্দেশ দিয়ে এক গ্লাস জল খাওয়া চাই। তা সন্দেশ থাকলেও খাই, না থাকলেও খাই।

অন্য একজন বললে, থাকলে যেন খেলে। না থাকলে কি রকম ক'রে খাও ?

প্রথমোক্ত ব্যক্তিটি বললে, না খেয়ে পারি না। কেমন যেন বদ অভ্যেস হয়ে গেছে।

যাকে বলা হ'ল সে বললে, সে তো বুঝলুম, কিন্তু সন্দেশ না থাকলে খাও কি ক'রে।

অপর ব্যক্তি বললে, আঃ বলছি যে বদ অভ্যেস। বহুকালের অভ্যেস কি না। থাক্ আর না থাক্, না খেয়ে পারি না। ওই যে বললাম বদ অভ্যেস।

বংশীবাবুর প্রসঙ্গে এসেছিলাম। বেঁটেখাট লোকটি বড় সুন্দর স্বভাব। তাঁর ছোট ভাই নববাবু। তিনিও আমার কাছে খুব আসতেন। তিনি লিখতেন গানের পরে গান। বহু বহু গান। হিন্দুধর্মের নানান ভাব নিয়ে অনেক গান তিনি লিখেছেন। নাম তার নবগোপাল সিংহ। একখানা পুস্তকও তিনি প্রকাশিত করেছিলেন। আমাকে এক copy দিয়েওছিলেন।

বংশীবাবুর দেহাবসান হয়েছে। তাঁর স্ত্রী ইন্দু দেবী—আমার ইন্দু মা বাঁকুড়াতেই এখন থাকে। বাঁকুড়ায় আমি একবার গিয়েছিলাম—এই সেদিন। বছর দুই হয়ে গেল। কিংবা তার একটু বেশী।

বাঁকুড়াতে যে বাড়ীতে আমি উঠেছিলুম সেই বাড়ীতে খুব ছোট্ট একটি মেয়ের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। তার বয়স এখন হয়তো হবে সাত কিংবা আট। বাঁকুড়ায় যখন গিয়েছিলাম তখন তার বয়স ছিল পাঁচ ছয়।

পরিচ্ছেদ—১৫

আমাদের অবস্থার কথা কিছু বলতে হয়। আমাদের অবস্থা এখন এমন দাঁড়িয়েছে, কেউ যদি কলমের খোঁচায় খোঁচাখুঁচি করে তবে আমাদের কাছ থেকে কিছু তথ্য সংগ্রহ করতে পারে। যেমন তেমন। যতটুকু ততটুকু।

তবে ওরই মধ্যে আর একটু কথা আছে। যিনি যেমন ধারা বলবেন অথবা লিখবেন তিনি তেমন ধারা পাবেন আমার কাছ থেকে। তিনি তেমন ধারাই পেয়ে থাকেন। যার যথা তার তথা।

আরও এক রকমে পায়। সে পাওয়া কেমন ক'রে যে পায় আমি বলতে পারি। যুক্তি নেই, তর্ক নেই, হিসেব নেই, নিকেশ নেই, হয়তো নিয়ম নেই কানুন নেই যে পাওয়ার সে পেয়ে যাচ্ছে। ও পেল কেন, সে পেল না কেন। সে কথা আমি জানি না। সে কথা আমি বলতে পারব না। হয়তো সে আমার কাছ থেকে আদায় ক'রে নিয়েছে। পাওনা ছিল, তাই আদায় ক'রে নিয়েছে। অথবা বলতে পারি সেই পরম একজনের ইচ্ছে। তাঁর ইচ্ছেতে সব কিছু হয়। তাঁর ইচ্ছে হয়েছে তাই এটা হয়েছে। অন্য কোনো কারণ খুঁজতে যাও কিসের জন্যে। তিনি চেয়েছেন তাই হয়েছে। তিনি বলেছেন তাই এমনটা হয়ে গেল।

অথবা এই ভাষাতে বলতে পারা যায় তিনি করাচ্ছেন আমি ক'রে যাচ্ছি।

এবারে আমাদের গল্পের ভিতরে আসি। প্রফুল্ল দেবী ঘোষ—যাঁর নাম দিয়েছিলুম নীরাজনা দেবী, আজ যদি থাকতেন কি যে কাণ্ড কারখানা করতেন তা আমি ভেবে পাই না।

তিনি যে আমাকে কি চোখে দেখেছিলেন সে কথা তিনি জানতেন

আর তাঁর চোখ জানত।

আমার সঙ্গে তাঁর প্রথমে দেখাটা হয়েছিল শান্তিনিকেতনে। শান্তি-নিকেতনেই প্রথম। যতদূর মনে পড়ে একটি সভাতে।

তারপরে অনেক ইতিহাস। কাশীতে গিয়ে দু দিন না তিন দিন কাশীতেই থেকে গেলেন। কোথায় যেন থাকতেন, হয়তো বা গঙ্গামায়ের আশ্রমে। আমার কাছে নিয়ত যাতায়াত। আমার কাছে এসে আমার কাছেই রান্নাবাড়া করতেন। ভাল কিছুই মনে পড়ে না। তবু আমার নীরাজনা মায়ের কথা মনে আছে। নীরাজনা মা-ই তো আমার প্রফুল্ল মা।

প্রফুল্ল মা আমার জীবনে এসেছিল আবার সে কোথায় চ'লে গেল। তাঁর জীবনের অবসান। আমার অনেক কথা সে আশ্চর্যরকম বুঝতে পারত।

এইভাবে কত লোকের সঙ্গে দেখা হয়েছে। কত লোক, কত লোক। আমারই ভিন্ন ভিন্ন মূর্তি সবাই। নানা রূপ, নানা ছাঁদ, নানা ভঙ্গীমা। আমি সকলের মধ্যেই আমাকে প্রণাম করি। আমি আমাকে স্বীকার করি এবং প্রণাম করি।

সেই একজন — শুধু সেই একজন। আমি রূপেও শুধু সেই একজন, তুমি রূপেও শুধু সেই একজন। তিনি রূপেও তাই।

পরিচ্ছেদ—১৬

প্রসঙ্গের পর প্রসঙ্গ আসছে। এসে গেল সুবালা মায়ের মা — তাঁর কথা। তাঁর কথা আগে কতটুকু বলেছি, সে কথা বলতে পারছি না। এখন যা মনে আসছে খাতায় রেখে যাচ্ছি। আমি বলছি, আর আমার এক মা লিখছে।

সুবালা মায়ের মা — তিনি একখানা বইও লিখেছিলেন। বইটার

নাম ছিল অর্ঘ্য।

আমায় তিনি কি চোখে যে দেখেছিলেন সে কথা আমি ভাল ক'রে কিছু বলতে পারব না। সংক্ষেপে কথাটা এই, সহসা একদিন দেখতে পেলাম, তিনি আমাকে চিঠির পর চিঠি লিখছেন। জমতে জমতে আমার কাছে একগাদা চিঠি জ'মে গেল। অবশেষে চিঠি হ'ল চল্লিশ পঞ্চাশখানা তো বটেই।

আমার মনে হয়, অথবা আমি মনে করি, আমি সেই একজনের কাছ থেকেই চিঠি পেয়েছি। সুবালা মায়ের মা যে-সব চিঠি লিখতেন, সে সব চিঠি সে একজনেরই চিঠি। সেই আমার মায়েরই চিঠি।

মা ব'লেই এখানে সম্বোধন করছি। ভগবানকে মা বলতে অনেক সময় আমার ভাল লাগে। তাই বলছি, সেই চিঠিগুলির ভিতর দিয়ে আমি পেয়েছি, সেই আশ্চর্য একজনারই ভালবাসা। অদ্ভুত সেই ভালবাসা।

গল্পটি আগে কোথাও রেখেছি কি না জানি না—মনে পড়ছে না। এখানে আবার রাখছি। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, এমন কি বৎসরের পর বৎসর আমি সেই মায়ের কাছ থেকে আশ্চর্য একটি ভাব প্রাপ্ত হয়েছি।

আমি বলছি, আমার তিনি মা। ঈশ্বরকে আমি মা বলি। ঈশ্বরই এইসব কত রূপে আমার কাছে এসেছেন। আমায় খবর দিয়েছেন। আমায় ডেকে পাঠিয়েছেন।

আমি রাসবিহারী এভিনিউতে তাঁদের বাড়ীতে যেতাম। চারতলার উপরে তাঁরা থাকতেন। শুনেছি সেই বাড়ীতে অনেক ভাল ভাল লোক বাস করতেন। ভাল ভাল লোক মানে, নাম করা সব সাহিত্যিক ইত্যাদি। যেমন একজন বুদ্ধদেব বসু।

সুবালা মায়ের মা যেখানে থাকতেন, সেই ফ্ল্যাটে আমি বরাবর উঠে যেতাম। তিনতলা অথবা চারতলার উপরে তাঁদের ঘর। আমি যে যেতাম সে ওই মহিলারই আগ্রহে এবং আন্তরিকতায়। তিনি কিরকম

অবস্থায় ছিলেন তখন, সে কথাটা এখানে একটু বিবৃত করি। তিনি সর্বদাই শুয়ে থাকতেন। উপুর হয়ে শুয়ে থাকাই তাঁর ছিল একমাত্র আসন। চিৎ হ'তে পারতেন না। ডান পাশে ফিরতে পারতেন না। বাঁ পাশেও না। একেবারে একটি অবস্থানে দিবা এবং রাত্রি সর্বদা কাটত।

হয়তো তাঁর ওই অবস্থার ডাক আমি উপেক্ষা করতে পারিনি। আমি মাঝে মাঝেই তাঁর কাছে উপস্থিত হ'তাম। যতদূর মনে পড়ে সপ্তাহে এক আধ দিন যেতাম। তিনি যে আমার জন্য কি রকম ভাবে অপেক্ষা করতেন সে-কথা বলাই বাহুল্য। তৃষিত হয়ে তিনি আমার পথের দিকে চেয়ে থাকতেন। অনেক সময় আমি গিয়ে তাঁরই ঘরে বসতাম। আবার তিনি বলতেন, তুমি আর একটু কাছে এসে ব'সো। আমি একটু এগিয়ে এলাম। আমার দারুণ সংকোচ।

তাঁর দিকটা কি বুঝতে পারি না। তাঁর দিকটা এখন যেন বুঝতে পারি। তখন ভাল ক'রে বুঝতে পারতুম কি না মনে নেই। কিন্তু এখন মনে পড়ে আর মনটা তাঁর কথায় এবং তাঁর ভাবে ব্যথিত হয়ে ওঠে।

একটা লোক চব্বিশ ঘণ্টা কুমীরের মত উপুড় হয়ে শুয়ে আছে—হয়তো মনের মত তেমন কিছু পায় না—হয়তো মনটা তাঁর কী যেন চেয়ে ফেলে—হয়তো, হয়তো কেন নিশ্চয়ই তাঁর ভিতরে সেই একজন পরম জনকে চাইছে। আমি তো জানি, আমাদের প্রত্যেকের অন্তর তাঁকেই ডাকে, তাঁকেই চায়।

একদিনের কথা। আমি নানান কাজে ব্যস্ত থাকি। সময় পাই না। একদা সন্ধ্যার কিছু পরে আমি তাঁর কাছে গিয়ে উপস্থিত। সিঁড়ি দিয়ে উঠেই বাঁ দিকের একখানা ঘরে তখন তিনি থাকতেন। আমার একটু দেরী হয়ে গেছে। তাঁর কাছে যাওয়ার আমার আর কোনো প্রয়োজন নেই। শুধু রোগে তিনি ভুগতেন তা নয়, একেবারে শয্যাগত। বিছানার সঙ্গেই তাঁর যেন সম্পর্ক। আমাকে পত্র লেখেন, আমাকে কাছে ডাকেন। আমার জন্য ব্যতিব্যস্ত। আর তো কোনো দিক নেই তাঁর। এই

অবস্থায় আমি তার কাছে না গিয়ে পারিনি।

সেদিন তাঁর কাছে গিয়ে তারপরে আমি একটা গান ধরলাম— হরিনাম লিখে নে রে প্রাণে। আমারই লেখা গান।

চিরকাল আমি গানের পাগল। গান লিখেছি এবং গান গেয়েছি। সে সমস্তই ভগবানের সম্পর্কিত গান।

সেদিন রাত্রে যখন গাইছিলাম তখন রাত্রি আটটা হবে। বর্ষাকালের দিন কি অন্য কালের দিন তা এখন আমার আর মনে নেই। এটুকু মনে আছে। তখন রাত্রি আটটা, কেননা আমি ওই সময়ে আমার নিজের তাড়াতে সজাগ ছিলাম অথবা খবর নিয়েছিলাম তখন ক'টা বাজে। তাছাড়া একজনের বাড়ি এসে অসময়ে গান করা বা কথা বলা যে সমীচীন নয় সে বিষয় আমি ওয়াকিবহাল ছিলাম। ওয়াকিবহাল থাকাই উচিত।

সে যা হোক, গান শেষ করবার পরেই খোলা দরজা দিয়ে দেখতে পেলাম বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন এক ভদ্রলোক। তিনি একজন দেশবিশ্রুত কবি। তিনি আমাকে বললেন- এটা ভদ্রলোকের বাড়ি। বাস্‌ এই কথাই যথেষ্ট। আমি তখনই উঠে পড়লাম। নীরবে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলাম।

তারপরে কয়েকটা দিন পরে—ঠিক ক'দিন আমার মনে নেই— আমার কাছে খবর গেল, আমার সেই মা চ'লে গেছেন। চ'লে গেছেন মানে তাঁহার দেহান্ত হয়েছে।

আবার আমি গেলাম সেই বাড়িতে। কয়েকজন ব্যবস্থা ক'রে অতিকষ্টে একখানি খাটিয়ায় তাঁকে নীচে নামালো। নামাবার সময় আমিও কাঁধ দিয়েছিলুম। পঞ্চভূতের দেহ পঞ্চভূতের দিকে যাত্রা করল। মাটির দেহ মাটিতে মিশেই যাবে।

সেই সময়টায় আমার মনে একটা ধাক্কা লেগেছিল। কষ্ট হয়েছিল। বৃদ্ধা রোগগ্রস্তা এক মায়ের কাছে আমি গিয়েছি গান শোনাতে। গান শুনে হবে তাঁর যন্ত্রণার লাঘব। আসবে কিছু শান্তি এবং সান্ত্বনা। আমি

গান শোনাচ্ছি। আর তাঁর ছেলের মুখে এই রকম ধরনের কথা। গালি তিনি দেন নি। বাকিও তিনি কিছু রাখেন নি। আমি বুঝতে পেরেছিলুম কতটা তিনি ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তিনি একজন সাহিত্যিক এবং কবি। মনে ভাবি এ কেমন সাহিত্যিক, এ কেমন কবি।

পরিচ্ছেদ—১৭

আর এক কথা কই। আমাদের আদর্শের কথা। আমাদের ভাবের কথা। একটা সূত্র অবলম্বন ক'রে আমরা দাঁড়াতে চাই। সুতো ধ'রে দাঁড়ানো যায় না। তাই বলছি প্রথমে দাঁড়াবার দরকার নেই। প্রথমে ধরব শুধু সুতো। আমরা সূত্রধর হবো। সুতো ধরলে ক্রমে দেখতে পাবো আমাদের অবলম্বন সুতো নয়, সুত্‌লি। সুত্‌লি ক্রমে দড়িতে পরিণত হয়। দড়ি হয়ে যায় রশি। রশি রূপ নেয় কাছিতে। এইভাবে আমরা আমাদের সেই মূল আদর্শের কাছাকাছি চ'লে আসি।

স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের একটা টান আছে। কিসের প্রতি যেন টান। কারোর প্রতি যেন টান। আমরা আকৃষ্ট হই। আমরা সহজেই আরও একটা জিনিসকে অবলম্বন করি। অবলম্বন না ক'রে আমরা পারি না। আমরা আর একজনকে না ধ'রে দাঁড়াতেও পারি না। এগিয়ে চলতেও পারি না। এই রকমই আমরা। এইটেই আমাদের স্বভাব।

এই স্থলে আমাদের কি করতে হবে। অর্থাৎ আমাদের কাজের দিক দিয়ে আমাদের কোন্ পন্থা অবলম্বন করতে হবে।

আমাদের করতে হবে এই, আমাদের আপন স্বভাবকে অবলম্বন ক'রেই বিকাশের পথে যাত্রা করতে হবে। এগিয়ে চলব কিন্তু অন্য কারও স্বভাব নিয়ে নয়। আমার পথেই আমাকে চলতে হবে। তোমার পথেই তোমাকে। রামের পথেই রামকে। শ্যামের দিক দিয়ে শ্যামকে।

চলবার সময়ে আমার যা আছে তাকেই ভাঙিয়ে খাবো। আমার যা নেই তাকে কেমন ক'রে কাজে লাগাবো। আমার আছে দুটি ভাব। আমি আমি এবং আমার আমার। "আমি"টাকে কাজে লাগাতে হবে আবার "আমার"টাকেও কাজে লাগাতে হবে। কোনোটাই ফেলা যাবে না। নষ্ট করবার কিছুই নেই। ঠিকমত কাজে লাগাতে পারলে সমস্তটাই সুন্দর, অপূর্ব এবং অপরূপ।

ধর, আমার মন গুটিয়ে আসে যে কোনো একটা বস্তুকে ধরতে। মন তো এই চায়। মনের এই রকম ধরন। মনকে তখন বলবো, ও মন, ধরবি তো ধর্। আমার আদর্শ-টাকেই ধর্। আদর্শ-টাকে ছাড়িস নে কিন্তু। আমি আমি ভাব দিয়েও ধর্, আমার আমার ভাব দিয়েও ধর্। যেমন তোর স্বভাব তেমন ভাবেই ধর্।

তোর জোর আছে "আমি" ভাবের উপর। বেশ তো "আমি" দিয়েই আঁকড়ে ধর্। "আমি"টাকে ডগায় তোল্। আমি অমুকের সন্তান, আমি অমুকের দাস অথবা আমি অমুকের আপনার লোক। আমি পারব না—এটা কি একটা কথা হ'ল। আমি পারব না আমার বাপ পারবে। আমাকে পারতেই হবে। এই হ'ল আমার জয়যাত্রা, এই হ'ল "আমি" ভাবের জয়যাত্রা। এরপরে আসবে পরাকাষ্ঠা।

যেমন "আমি"র দিক দিয়ে বললাম তেমন "আমার" কথাটার দিক দিয়েও। আমার গুরু। আমার গুরুর আদর্শ, আমার গুরুর ভাব, আমার গুরুর প্রদর্শিত পথ, এ যে আমারই আনন্দ। এ যে আমারই অন্তরের আন্তরিকতা। এই স্থলে আমার অন্তরে কোনো দ্বিধাবিভক্ত ভাব নেই। আমার আমার ক'রে আমি আমার ঠিক জিনিসকে ধরেছি। বুঝেছি তাই ধরেছি। সত্য ব'লে জানতে পেরেছি তাই অবলম্বন করেছি।

আমার এই কামড় বুলডগের কামড়। আমার দাঁত থেকে দাঁতকে ছাড়ায় এমন সাধ্য কার। আসল কথাটা এই, সত্যই আমার মূলধন। কোনো প্রকার লৌকিকতা, কোনো প্রকার দেশাচার, লোকাচার, স্ত্রী আচার

আমার সত্য কেড়ে নিতে পারে না। আমার সত্য যে আমার সাথে এক হয়ে গেছে। আমার সত্য যে আমারই স্বরূপ। আমার সত্য যে আমারই আর এক সত্তা।

আমি কি আমার থেকে আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারি। সেই রকম আমি আমার ভগবানকে অর্থাৎ সত্যকে অর্থাৎ সেই পরম আশ্চর্য প্রাণের বস্তুকে দূরে ঠেলতে পারব না।

এইভাবে আমি আমাকে একটু একটু চিনতে পেয়েছি। একটু একটু চিনেছি কি বেশী বেশী চিনেছি সে কথা আমি খুব স্পষ্ট ক'রে বলতে পারি না।

কথাটা এই, আমি চিনেছি। ধীমহি—আমি জানি। চিনতে পারবার ফলেই জানতে পেরেছি।

তাই আমি সেই জিনিসটাকে—সেই আমার আসল বস্তুটাকে বোঝার মত বুঝতে পেরেছি। তারপরে সেই গীতার কথা আসে—করিষ্যে বচনং তব।

করিষ্যে বচনং তব। আমি তোমার কথা অনুসারে চলব। অর্থাৎ আমি তোমার বাক্য পালন করব। করিষ্যে বচনং তব ব'লে আমি কথা দিলাম। হে ঠাকুর, হে ঈশ্বর আমি তোমার কথা অনুসারে চলব। কিন্তু তোমায় পাচ্ছি কোথায়। আমি এখন সকলের প্রতিনিধি। আমি তোমাদের সবাইকার একজন। তোমাদের হয়ে কথা বলছি। পরম দেবতাকে আমি পাচ্ছি কোথায়। পরম সেই দেবতা—যিনি সকলের সকল কিছু হয়ে সর্বত্র সদা বিদ্যমান তাঁর দেখা পেয়েছি কি?

আমি তাঁর দেখা পাইনি বটে তবু এমন একজনের দেখা পেয়েছি যাঁর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ নিত্য যোগাযোগ।

আমি আমার গুরুর কথা এ স্থলে বলছি। আমার গুরু তাঁর দেখা পেয়েছেন। তাঁকে শুধু পেয়েছেন তাও নয়, তাঁর সঙ্গে একেবারে এক হয়ে গিয়েছেন। আমি আমার গুরুকে পেয়েছি ব'লেই আমি সর্বদা সেই

একজনের সঙ্গে যোগাযোগে আছি।

আমি আমার গুরুর চরণের কাছে আসতে পেরেছি এটাই আমার জীবনের সর্বোত্তম সুযোগ। আমি আমার গুরুকে দেখেছি মানেই তাঁকে দেখেছি যাঁকে দেখলে জীবনের সকল দেখার সাধ মিটে যায়—আর কিছু দেখার প্রয়োজন থাকে না।

আমি আমার গুরুকে দেখেছি ব'লেই তাঁকেও দেখেছি। তিনিই তো গুরুরূপে এসেছেন। আর কেউ তো গুরুরূপে আসেন নি। আর কারোর তো গুরুরূপে আসবার অধিকার নেই। জগতের গুরু—জগতের ঈশ্বর আমার কাছে আমার গুরুর রূপে এসেছিলেন।

এখানে আরও কিছু কথা বলা প্রয়োজন। হয়তো বা না বললেই নয়। আমার এই ক্ষেত্রটি কিঞ্চিৎ অন্যরকম। সেই দিকের কথা কিছুটা বিস্তারিত না বললে এখানে সব কথা পরিষ্কার হয় না।

আমি লোকটা আমার জীবন-কথা বলতে বসেছি। আমার উচিৎ কথাটাকে যতদূর সম্ভব পরিষ্কার ক'রে বলা। যে ভাবে বললুম, সেই ভাবে বলা সাধারণ ভাবে বলা। এখানে ব্যাপারখানা কেবলমাত্র তা তো নয়। এখানে এই দেহটাকে অথবা এই খাঁচাটাকে দিয়ে তিনি যে আরও কিছু কাজ করিয়ে নেবেন মনে করি। করিয়ে নেবেন শুধু নয়, করিয়ে নিচ্ছেন।

তাঁর হাতে অনাদি অনন্ত শক্তি, অপরিসীম ভাব, পর্যাপ্ত অথবা অপর্যাপ্ত ঘটনা। তাঁর ভাণ্ডারে কী নেই। সেখানে সমস্তই যে আছে।

আমার এই সত্তাটাকে অবলম্বন ক'রে তিনি কাজ করছেন। আমি বলি তাঁকে কাজ করতে দাও। তাঁর যেন কোনো প্রকারে বিঘ্ন না করি।

তিনি যে স্বতন্ত্র। তিনি যে খেয়ালী। তাঁর যেমন ইচ্ছে তিনি করবেন। তাঁর ইচ্ছেমত তিনি করুন।

আমার যা মনে হয় তাই বলি। আমার ভাবটা আমি গাইছি। আমার কথাটা আমি ব'লে যাচ্ছি কিন্তু। আমার ভিতরে তিনটি সত্তা রয়েছে। ইংরাজীতে যাকে বলে entity. প্রথম সত্তাতে আমি যেমন

আছি তেমনি। খাই, দাই, ঘুমাই, গল্প করি, হাসি। হয়তো কাউকে বকছি। হয়তো বা কত রকম ঝ্যাকড়া করছি ইত্যাদি।

আমার দ্বিতীয় সত্তাতে আমি অনেক দূর পর্যন্ত বুঝতে পারি এবং জানতে পারি। এই দ্বিতীয় সত্তা অনেক কিছু ভাবায় এবং অনুভব করায়। এখানে থেকেই আমার গান লেখা চলে, কবিতা রচনা চলে। এইখানেতেই এই খাঁচার থেকে অনেক কিছু প্রকাশ পায়।

আর একটি সত্তা আমার জীবনের মধ্যেই রয়েছে। সেই সত্তাটিই আশ্চর্য এক বিশাল সত্তা। এখানে আমি অনাদি এবং অনন্ত, বিরাট এবং মহান, সম্পূর্ণরূপে সীমাবিহীন। এই রূপটাই আমার প্রকৃত রূপ অর্থাৎ স্বরূপ। এইরকম ভাবে তিনটি দিক দিয়ে আমার তিনটি সত্তা।

এইভাবে যেমন আমি এখানে, তেমন আমি ওখানে। যেমন আমি অল্প, তেমন আমি ভূমা। যেমন আমি সীমাতে সীমাবদ্ধ, তেমন আমি সীমাবিহীন—অনাদি এবং অন্তবিহীন।

আমি যেমন ছোটো তেমন বড়। যে-কেউ আমার কাছে আসবে সে যেন আমার সকল দিককে ভাল ক'রে বোঝবার চেষ্টা করে। যদি বুঝতে পার তো বোঝ। আমার দর্শনটাকে অর্থাৎ আমার মতবাদকে কিংবা বলতে পারা যায় আমার ভাবধারাকে বুঝবার চেষ্টা কর। যদি পার তো বুঝে নাও।

যদি না পার, তবে তোমাকে যা বলছি সেইটা ক'রে চলো। কোনো-দিকে না তাকিয়ে যেমন বলছি তেমন কর।

তারপরের কথা এই, যদি এরকম করতে সক্ষম না হও—যদি তোমার সাধ্যে না কুলোয় তবে কি আর করবে, আমার পথের হয়ে যাও, হয়ে যাও আমার দলের, হয়ে যাও আমার ভাবের। এই স্থলে আমার চলাফেরা অথবা আমার হাসিগল্প অবলম্বন ক'রে তুমি চিন্তার ধারাকে এই স্রোতেতে বইয়ে দাও।

আমি আমার জীবন-কথা বলতে বসেছি। আত্মকাহিনী বলছি বা

ব'লে যাচ্ছি এ কথাও বলতে পারা যায়। আমার গান আমি গেয়ে চলেছি। যেমন আসছে আমি তেমন গাইছি। সুর বেসুর, তাল বেতাল যেমন আমায় দিচ্ছে তেমন দিয়ে যাই।

গেয়ে যাই আমি গেয়ে যাই। আমার আপন গান আমি গেয়ে যাই। যেমনভাবে আমাকে আমি পেয়েছি তেমনভাবেই আমাকে আমি সাজাই।

এই যে আমাকে সাজাচ্ছি এ আর কিছু নয়, আমাকে যেন বাজাচ্ছি। আমার বীণা বাজাচ্ছি। অথবা আমার বাঁশী আমি বাজাচ্ছি। অথবা বলা যায় আমি বাজাচ্ছি আমার বেহালাকে। ছড়্ টানছি আমার মনের মত ক'রে। আঁচড় কাটছি আমার প্রাণের আনন্দ দিয়ে।

পরিচ্ছেদ—১৮

অনেকদিন আগের একটা কথা মনে পড়ল। জ্যোতির্ময় মুখার্জী—যার ডাক নাম গৌর তাকে একদিন বললাম,—শোনো হে গৌর, একটা বেহালা আমায় কিনে দিতে হবে। বেহালা বাজাবার আমার শখ হয়েছে।

গৌরের সঙ্গে ঠিক ক'রে একদিন ওর সঙ্গে গেলাম ডালহাউসি স্কোয়ারে এক বেহালার দোকানে। একটা বেহালা কেনা গেল। দোকান থেকে কিছু বইপত্রও কিনলাম প্রাথমিক বেহালা শিক্ষার উপলক্ষ্যে। এইভাবে শুরু হ'ল আমার বেহালা।

তারপরে বেহালাতে দ্বিতীয় শিক্ষা শুরু করলুম আমার মা সুশান্তা শেঠের কাছে।

আমার বেশ মনে পড়ে লিলুয়াতেই হাতে খড়িটা হয়ে গেল বেহালায়।

বেহালা বাজাতুম আর বাজাতুম। যেমন খুশি—যত খুশি বেহালা বাজনা চলত। আমার হাত চলত। তার সঙ্গে বেহালার ছড়্ও চলত।

অনেক সময় আমার পা-ও যে চলত না তা নয়। Central Park-এ মহেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে ক' বছর ছিলাম। অনেক সময় সেই বাড়ীতে মনের সাধে বেহালা সাধতাম। নেচে নেচেও যেন সাধতাম। বেহালা ছিল আমার সঙ্গী।

একবার কাশীতে গিয়ে অনেকদিন ছিলাম। সেখানেও আমার সঙ্গে আমার সাথী বেহালা।

এই বেহালার কথায় আমার আর এক কথা মনে পড়ছে। আমি ব'লে থাকি—অন্তত আমার প্রাণের কথা আমি জানিয়ে রাখি—একেবারে স্থির হ'তে আমি চাই না। আমি চাই না নিথর, নিষ্কম্প হয়ে সমাধি অবস্থা। সমাধি বলতে যদি বোঝায় স্পন্দনবিহীন শান্ত এক চেতনাতে জেগে ওঠা তবে সেই রকম সমাধি আমি চাই না।

সব থেমে গেল, পরমা শান্তিতে আমি ডুবে গেলাম—এ রকম চাহিদা আমার আছে ব'লে আমার মনে হয় না। কোনো এক সময়ে ক্ষণের তরে ওই রকম অবস্থা আমি চাইতে পারি। কিন্তু ক্ষণের তরে। স্পন্দনের বীজ আমার ভিতরে রয়েছে যে। আমি আসলে যে স্পন্দনময়।

থেমে যেতে আমি চাই না। ডুবে যেতে আমি চাই না। আমার ভিতরে গান চলুক এবং সঙ্গে সঙ্গে ভাবও চলুক। কিন্তু ছন্দে ছন্দে। এলোপাথাড়ি নয়, ছন্দে ছন্দে। আমি যে দেখতে পাচ্ছি এ কথাই আরও বড় কথা। পর্যাবসান শূন্যে নয়, পর্যাবসান পূর্ণতায়।

শেষকালে যে জিনিস সেখানে কী নেই? সেখানে সব কিছুই আছে। সকল মানুষ আছে, সমস্ত জীবজন্তু আছে, যাবতীয় বৃক্ষলতা আছে, আর আছে যেখানে যত কীট পতঙ্গ। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবদেরও নিবাস সেইখানেই।

বড়র থেকে বড় প্রাণী যত রয়েছে সব সেই জায়গাতেই আছে। তিমি মাছ, মস্ত হাতি, বিকট সব জন্তু জানোয়ার সব সেইখানে, সব সেইখানে।

বৃহৎ হ'তে কণা পর্যন্ত সেইখানেই রয়েছে। সেইখানেতেই সবকে

আমি দেখতে পাচ্ছি। আমি যে সবাইকে রেখেছি সেইখানে। ছোটকেও রেখেছি বড়কেও রেখেছি। অন্ধকারকেও রেখেছি আলোকেও রেখেছি। সেইখানে আর সেইখানে।

আর কোথায় রাখব। রাখবার মত আর তো জায়গা নেই। তাই সমস্ত কিছু সেইখানেতেই থাক্।

সেইখানেতেই আছে, সেইখানেতেই থাক্। সকল প্রাণী, সকল পদার্থ, সকল বস্তু, সকল প্রকাশ, সকল অন্ধকার, সকল পাপ এবং পুণ্য, আমার সকল সুখ এবং দুঃখ, সকলের সকল শুভ এবং অশুভ—সমস্ত সেইখানেতেই থাক্। যেখানেতে সমস্ত নিহিত সেইখানেতেই থাক্।

বেহালার গল্প বলছিলুম। বেহালার গল্পই করি। এক ব্যক্তি একটি বেহালা হাতে ক'রে আমার ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। পাথরের প্রতিমার মত সে দাঁড়িয়ে আছে। আমি তাঁকে বললুম, ও মশাই দাঁড়িয়ে কেন। বলি ও মশাই, চুপচাপ কেন। ছড়ে টান দিন। আঁচড় কাটুন। একখানা রাগ ধরুন। এখন সকাল বেলা। সকালবেলাকার একখানা তেমন তেমন রাগ ধরুন।

না, না, ও রকম চুপ ক'রে থাকলে চলবে না। আপনি রাগ না ধরলে আমার যে রাগ ধ'রে যাচ্ছে।

ঘরের সামনে কেন আর। সোজা ঘরের ভিতরে চ'লে আসুন। বসুন। ইচ্ছে হয় তো দাঁড়িয়েই বাজান। বেহালাটি বাগিয়ে ধ'রে বাজাতে শুরু করুন দেখি।

ও রকম কাঠ হয়ে থাকবেন না। কাঠ হয়ে থাকা আমি চাই না। আমি কাঠও চাই না, পাথরও চাই না। আমি চাই মানুষ—জলজীবন্ত মানুষ। হাসবে, কাঁদবে, নাচবে, গাইবে—এরকম একজন মানুষ।

তবে একটি কথা বলি। আমি মানুষ চাই বটে, তবে বেসুরো, বেতালা, বেকায়দা, বেফায়দা কোনোকিছু আমার পছন্দ না। ওই রকম জিনিস এই দুনিয়াতে যথেষ্ট আছে। অভাব কিছু নেই। তবে অভাব

ভাবের। আমি সেই ভাবকেই চাই। অভাবের পরপারে সেই যে নিত্যকারের ভাব সেই ভাবেরই আমি খোঁজ করছি।

আরও খুলে বলি। সব থেমে যায় সমাধিতে। সেই সমাধি আমার লক্ষ্যবস্তু নয় কিন্তু। সমাধি ব'লে একটা জিনিস আছে আমি জানি। আবার চরম সমাধি অর্থাৎ চূড়ান্ত সমাধি আছে। নিশ্চয় আছে। কিন্তু সেই সমাধি আমার চাইবার বস্তু নয়।

সমাধিতে আমি থেমে যেতে চাই না। আমি থামতেই চাই না। যেমন নামতে চাই না, তেমন থামতেও চাই না।

আমি বুঝতে চাই। ব্যাপারখানা বুঝতে চাই। আমি দেখতে চাই, জানতে চাই আর বোঝার মত বুঝতে চাই।

আমি চাই সামঞ্জস্য। আমি চাই ছন্দ। স্বচ্ছন্দের ছন্দ আমি চাই। আমার যে সেইখানেই আনন্দ। শুধু আমার কেন সকলের— প্রত্যেকের সেইটেই তো আনন্দ। সেইখানে যে স্বাচ্ছন্দ্য। তাই সেখানে আনন্দ।

তাই বেহালার বাজনদারকে বলছি, এসো এসো আমার কাছে এসো। ঘরে এসো। জীবনের মাঝখানে যে ছন্দ রয়েছে সেই ছন্দে তোমার বেহালাতে একখানা গান ধর।

বেহালা বেজে উঠলেই গান শুরু হয়ে যাবে আপনা আপনি।

গান আর বাজনা কি পৃথক।

বাজনদারকে ডেকে আমি বলছি, তুমি ঘরে এসো বাপু। তুমি আমার ঘরে আমার কাছে এসো। খুব কাছে এসো না কিন্তু। খুব কাছে এসে পড়লেই তোমাকে আমি হারাব। খুব কাছে আসবার দরকারই নেই।

একটা ফুল আমার সামনে দুলছে। ফুলটাকে ছিঁড়ে আরও কাছে নিয়ে এসে যদি আমার নাসিকা-রন্ধ্রের মধ্যে ঢুকিয়ে দিই তবে ফুলের সঙ্গে খুব ভালো একটা সম্পর্ক স্থাপিত হ'ল কি? ফুলটা খুব কাছে আসলেই

অথবা আমার নাকের ভিতর প্রবেশ করলেই সবখানি হ'য়ে গেল না। অত সহজ নয়।

কাছেটা কাছে নয়। অতিরিক্ত কাছে মানেই দূরে। এইখানেই তো জীবনের art. খুব কাছে ক'রে কিছুকে পেতে চাও তো তাকে খানিকটা দূরে রাখতে হবে। ওর মধ্যে একটা হিসেব আছে। সেই হিসেবটা যদি কেউ পায় তবেই সে উত্‌রে গেল। সে হিসেবটা পাওয়া যায় কোথায়? আমাদের প্রচলিত ভাষায় বলতে গেলে অথবা আমাদের সাবেক রীতিতে বলতে গেলে বলতে হয় সেই হিসেবটা পাওয়া যায় গুরুর কাছে।

গুরুর সম্বন্ধে আমি বহুৎ ভেবেছি এবং কিছু কিছু লিখেছি। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন তাঁর নিজের হিসেবে। রবীন্দ্রনাথ অপরূপ এবং সুবিশাল। তাঁর দিকে তাকিয়ে তাঁকে শুধু প্রণাম করাটাই ঠিক। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—গুরু গুরু দেয়া ডাকে। অপরূপ প্রকাশ। এরকম ভাবে প্রকাশ করা আমার বাপেরও সাধ্য নেই।

সে যাক। আমি আমার কি কথা বলছিলুম। গুরুর কথা এসে গিয়েছিল। অনেক সময় আমি মনে ভেবেছি আমার সাহিত্য থেকে গুরু শব্দটা তুলে দিলে কেমন হয়? গুরু শব্দ অনেক অনেক দিন চলছে। বহু যুগ থেকে। শুনেছি অথবা মেনে নিয়েছি। শিব বলছেন পার্বতীকে গুরুর সম্বন্ধে। সেই সব কথাই গুরুগীতা নামে প্রসিদ্ধ। গুরুকে অবলম্বন ক'রে যাঁরা চলতে চান গুরুগীতা বইখানা তাঁদের কাছে একরকম অপরিহার্য।

কিন্তু আমি অনেক সময় মানুষের অবিমৃষ্যকারিতায় কাতর হয়ে রেগেমেগে বলেছি—দুত্তোর, গুরু শব্দটাই আর ব্যবহার করব না। এই নিয়ে আলোচনাও করেছি। তবু ঘুরেফিরে আবার সেই কথাই মনে আসে —গুরু শব্দটা আমাদের দেশে প্রাচীন কাল থেকে বহুল প্রচলিত। মানুষের মানসিকতার সঙ্গে এই শব্দটি একেবারে কানে কানে লেগে এক

হয়ে গিয়েছে। মোট কথা, এই শব্দটি ত্যাগ করা যাবে না। যতদিন আমাদের সমাজের জীবন থাকবে ততদিন পর্যন্ত হয়ত বা এই শব্দটিও টিঁকে থাকবে।

যে কথা বলছিলুম। যে কথা দিয়ে এই প্রসঙ্গ আরম্ভ করেছি। বাজনদার আমার দরজার বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে। বাজনদার বেহালা বাজায়। তাকে ঘরের মধ্যে ডেকেছি। সে তার বেহালা নিয়ে আমার কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে। তার মুখের নীচে বেহালা। বাঁ হাতের উপরে। বেহালাকে বলা হ'ত বাহুলীন। সেই কারণেই হয়ত ইংরাজীতে বেহালাকে বলা হয় ভায়োলিন।

বেহালা আমিও বাজাতুম। খুব একটা ওস্তাদ হয়ে গিয়েছিলুম তা নয়। তবে বেহালা আমার জীবনের মধ্যে প্রবেশ করেছিল। বেহালাকে নিয়ে আমি খুব আনন্দেই থাকতুম। কখনো কখনো এরকম হ'ত আমি বেহালা বাজাতুম তা নয়। বেহালাই বুঝি আমাকে যেন বাজাতো। কখনো কখনো বেহালার বাজনায় আমি কিছু কিছু বেহাল হয়ে পড়তাম।

ফস্ ক'রে আমার একটা কথা মনে প'ড়ে গেল। আমার ঘরে একখানা মা কালীর মূর্তি রাখা ছিল। দেয়ালের গায়ে একটা ব্রাকেটের মতো ছিল। কলিকাতায় সেণ্ট্রাল পার্কের কথা বলছি কিন্তু। আমার ঘরে একপাশে এইভাবে থাকতেন মা কালী—আমাদের কুলদেবতা।

এখন সব অন্যরকম হয়ে গেছে। মা কালী কি চ'লে গেছেন? মা কালী কোথাও চ'লে যান নি। মা কালী আরও ভাল ক'রেই আছেন। মা কালী তাঁর স্ব স্বরূপে প্রতিষ্ঠিতা।

একজন আছেন। সেই একজন আছেন। তিনি আছেন তাই সকল জনই আছেন। কেউ বাকি নেই গো, কেউ বাকি নেই। যিনি সকলের মধ্যে এক তিনি যে আছেন। তিনি আছেন তাই সকলই আছে। তাই সেদিক দিয়ে আর অসুবিধা কিছুই নেই। এক আছে। একের মধ্যে সবাই আছে—সকল কিছুই আছে আবার সেই সমস্তের মধ্যে যে

থাকবার সেই আছে। মোট কথা আমার ভাষায় সেই একজন মাত্র আছে। সকল নিয়ে এবং সকল ছাড়িয়ে।

আমি তো ভাষাকে আর তৈরি করি নি। ভাষা আমার ভিতর থেকে আপনা আপনি প্রকাশ পেয়েছে। আমিও যেমন আছি আমার ভাবও তেমন আছে, আমার ভাষাও তেমন আছে। ভাষার ভিতর দিয়েই আমার অন্তরের বহিঃপ্রকাশ। ফুল যেমন ক'রে ফোটে আমি তেমন ক'রে ভাষার ভিতর দিয়ে ফুটছি।

এবার সেই কথায় আসি। লোকটা বেহালা কাঁধে ক'রে আমার ঘরে ঢুকে একপাশে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো। নড়েও না, চড়েও না। সমাধি হ'ল নাকি? আমি এরকম চাই না। সমাধির মত কিছু আমি চাই না। সমাধি আমার অনভিপ্রেত। সমাধির মত যেমন আমি কিছু চাই না তেমন আমি সমাধি জিনিসটাকে চাই না।

সমাধি নেই সে কথা আমি বলছি না। সমাধি একটা দারুণ বস্তু। সমাধিতে অনেক কিছুর সমাধান। অনেক ব্যাপারে সমাধিই শেষ কথা। সমাধিতেই পর্যাবসান। জীবনের সকল সমস্যা সমাধিতে শেষ হয়ে যায়। এ কথা আমি কিন্তু স্বীকার করছি। কিন্তু তবু আমি বলছি সমাধি জিনিসটা আমি চাই না। সমাধিতে আমার রুচি নেই।

এইখানে একটা কথা চুপিচুপি বলছি। চেতনার কোনো একটা ক্ষেত্রে আমি সমাধি অবস্থার দরজার ভিতর দিয়ে এসেছি কি? আমার মনে হয়, আমি ওই রকম কোনো একজাতীয় অবস্থা পার হয়ে চ'লে এসেছি। হয়ত খুব সচেতন থেকে অথবা সজাগ ভাবে আমি ওই পথ অতিক্রম করি নি। তবু ওই সমস্ত অবস্থা ফেলে চ'লে এসেছি। এই রকমটা আমি যেন বুঝতে পারি।

আসলে আমাদের পথ যোগপথ। আমার পথটা যোগের পথ। এই যোগ অন্য যোগ নয়। গীতার যোগ। গীতার যোগ এমন একটা যোগ যেখানে অর্জুন-বিষাদ-যোগ অবধি একটি যোগ। যোগের

অনেকগুলো স্তরের ভিতরে এটাও একটা স্তর। তবে এটা একটা প্রাথমিক স্তর। প্রাথমিক হ'লেও এই স্তরটা গীতারই স্তর।

গীতার যোগ আরম্ভ অর্জুন-বিষাদ দিয়ে। শেষ মোক্ষে। এই মোক্ষ তুচ্ছ একটা বস্তু নয়। কোনো কোনো সম্প্রদায়ে সাম্প্রদায়িকতা এতদূর পর্যন্ত যায় যে, মোক্ষ বস্তুকেও একটা তুচ্ছ অবান্তর ব'লে হাল্‌কা ক'রে তোলা হয়।

আমি বলি, মোক্ষ যদি গীতার মোক্ষ হয়ে থাকে তবে সেই মোক্ষ মোক্ষযোগ—যোগ ছাড়া কিছুই নয়—এটা যেন মনে থাকে। সাধারণ ভাবে বলতে গেলে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার পথে মোক্ষ যোগ শেষ কথা। তবে তার ওপরেও আছে। সেইটা শেষের পরে শেষ। সেইখানে সাধারণ মানববুদ্ধি যেতে পারে না।

কথাটা দাঁড়াচ্ছে এই রকম, সাধনার যাত্রাপথে মানুষের জীবনে পদক্ষেপ শুরু হয় বিষাদ অবলম্বন ক'রে। বিষাদ অবসাদ এইসব জিনিস মোটেই ফ্যালনা বস্তু নয়। দুঃখ দিয়েই তো শুরু। প্রথমেই দুঃখ। তারপরেও আছে। দুঃখের পরে দুঃখ। যতই দুঃখ ততই জাগরণ। দুঃখ পেতে পেতে চলা—এর অর্থ-ই এগিয়ে চলা। যেখানে দুঃখ থেমে গেল সেখানে জীবনের গতিও থেমে গেল।

তবে দুঃখের প্রকার ভেদ আছে। দুঃখের সঙ্গে থাকা চাই একটা জেগে ওঠার ভাব, একটা বুঝতে পারা। দুঃখের সঙ্গে বোঝা জিনিসটা দরকার। বোঝার মধ্যেই দুঃখ বস্তুটা সার্থক হয়ে ওঠে। অর্থ-টা খুঁজে পেলেই তখন দুঃখটা হয়ে ওঠে সুন্দর। দুঃখও থাকে সৌন্দর্যও থাকে।

তারপরে পরিশেষে এমন জায়গায় গিয়ে পড়ি—যেখানে সর্ববিধ ক্ষুদ্রতার থেকে মুক্তি। ক্ষুদ্রতা, বন্ধন, অন্ধকার—এ সব একই ধরনের জিনিস। এটা থাকলেই ওটা আছে। এসব ছাড়িয়ে যখন উদার অনন্ত আকাশের ক্ষেত্রে পৌঁছে যাই তখন পাই মুক্তির ক্ষেত্র। এইখানে যে যোগ সেইটেই মোক্ষ যোগ। গীতা অবশেষে আমাদের এইখানে এনে

উপস্থিত করে।

যে কথা হচ্ছিল আবার সেই কথায় ফিরে আসি। বেহালা বাজনদারকে বললুম—তুমি একপাশেতে ওই রকম কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলে কেন ?

বাজনদার বললে—আমি চঞ্চল হ'তে চাই না। আমি চাই সমাধি অবস্থা। আমি যে শান্ত হ'তে চাই। একদম শান্ত। একেবারে স্থির। সকল বৈচিত্র্যের পরপারে সকল রকম কান্নাকাটি ডিঙিয়ে আমি চুপ ক'রে যেতে চাই। সেইজন্যেইতো দাঁড়িয়ে আছি। এখন আমার একমাত্র কাজ সর্বকর্ম ত্যাগ ক'রে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকা। একেবারে নট্ নড়ন-চড়ন। সব কিছু একেবারে থেমে গেলে তবেই তো পর্যাবসান। এইখানেই তো সার্থকতা। এইখানেই তো সুন্দর।

আমি বাজনদারকে হাতজোড় ক'রে বলছি—না হে বাপু, না। তোমার একটা ভুল হয়ে গিয়েছে। সেইটা মূলে ভুল অথবা ঠিকে ভুল যা ইচ্ছে বলা যায়। ভুলটা কি রকম বলব ? ভুলটা একটু বড় রকমের ভুল।

থেমে যাবে কি জন্যে ? অচল হ'য়ে পড়বে কেন ? অচল হ'লেই অধম। তোমার হাতে যে বেহালা সেই কথাটা কি ভুলে গেছ ? অফুরন্ত রসের উৎস তোমারই কাছে। বলি তুমি থামবে কেন ? থামা মানেই তো নামা। তুমি বাজবে, তুমি বাজাবে এবং সাজাবে—তুমি নাচবে এবং তুমি গাইবে। তখন দরকার হয় তুমি ভুলবে। কিন্তু ভুলবে সাময়িক। ভুললে ভুলতে পার অল্পক্ষণের জন্য। ক্ষণের তরে ভুলে গেলে ক্ষতি নেই।

কিন্তু আবার তুমি জেগে উঠবে আপন চেতনায় যত শীঘ্র হয় তত শীঘ্র।

তুমি যে পথিক। তোমার যে কেবল এগিয়ে চলা। কোথাও থামবার হুকুম নেই। বুঝতে পেরেছ-কথাটা ? তাই আবার আবার তুমি ভুলবে। তোমার হাতে রাগ বাজতে থাকুক। 'রাগ' শব্দ এসেছে একটা

আশ্চর্য ধাতুর থেকে। রঞ্জ্ ধাতুর থেকে। তোমার অঙ্গুলি চালনায় একটি রাগ মূর্তিমান হয়ে উঠুক। ডান হাতে ছড়ে টান দাও। তোমার শরীরটাও চলতে থাকুক ডাইনে এবং বাঁয়ে।

চঞ্চলতাতেও আপত্তি কি? তুমি চঞ্চল হয়ে ওঠো। আনন্দের ছন্দে ছন্দে তোমার ওই চঞ্চলতা সেই আশ্চর্য পুরুষের অপরূপ আরতির রূপ পরিগ্রহ করুক।

মোটের উপর কথাটা এই, সমাধির দিকে তাকিও না। এই দেশেতে কতগুলো ভুল চ'লে আসছে। তারমধ্যে সমাধিকে জীবনের মাঝখানে একান্ত ক'রে দেখা অথবা চাওয়া অন্যতম। সমাধিটা তো ভুল নয়, সমাধিটাকে জীবনের মধ্যে চাওয়াটাই ভুল। সমাধিটাকে বুঝে, এই বোঝার দ্বারা সমাধিটাকে ছুঁয়ে, সমাধিটাকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে চলতে হবে। ওই উদার অনন্ত আকাশে তোমার পথ।

আর একটি কথা। সমাধিতে অথবা সমাধির মত জিনিসে তুমি ডুবতে যাচ্ছ মানেই তুমি অবজ্ঞা করছ ওদের সবাইকে—যারা তোমার আশেপাশে রয়েছে, যাদের জীবন দুঃখে দুঃখী অন্তরে এবং বাহিরে। চারিদিকে চোখ পড়লেই তুমি দেখতে পাও অগণিত লোক কষ্ট পাচ্ছে। শুধু কি লোক। কষ্ট পাচ্ছে সবাই।

কষ্ট পাচ্ছে মানুষ। কষ্ট পাচ্ছে কুকুর বেড়াল, কষ্ট পাচ্ছে ছাগল মুরগী, কষ্ট পাচ্ছে পোকা মাকড়, কষ্ট পাচ্ছে ছোটোর থেকে ছোটো কত শত প্রাণী।

ছোটোর থেকে ছোটো প্রাণী, আবার বড়র থেকে বড় প্রাণী। সবাই সবাই। ভয় পেয়ে দৌড় দেয় আরশোলা, মাকড়সা—দেখতে পাও না?

বড়র দুঃখ একরকম আবার ছোটোর দুঃখ আর এক রকম। বড় প্রাণীর বড় দুঃখ ছোটো প্রাণীর ছোটো দুঃখ। এই রকমই মনে হয়। কিন্তু দেখতে পাই প্রাণী বড় বা ছোটো ব'লে তার দুঃখের গভীরতার তারতম্য হয় না। দুঃখটা এখানেও যেমন দুঃখ, সেখানেও তেমন দুঃখ। হাতিতেও

গভীর দুঃখ, মানুষেও তেমন গভীর দুঃখ। আরও ক্ষুদ্র প্রাণীতে তেমনই দুঃখের স্পন্দন। চেহারা বড় কি ছোট তাতে যায় আসে না।

আকাশের অথবা গাছের পাখি কাঁদতে থাকে, কাঁদতেই থাকে। যখন কাঁদে তখন তার কান্না থামানো যায় না। এই রকম একটা পাখির কান্না দিয়েই তো রামায়ণ শুরু হয়েছিল। রামায়ণ ভরাই তো কান্না। সীতার কান্না, রামের কান্না, আরও কত জনের কান্না।

এই দুঃখের ইতি করবার জন্যই কত মানুষের কত প্রয়াস। আমারও প্রয়াস।

দুঃখের শেষ হয়ে গেলে প্রয়াস বস্তুটারও শেষ হয়ে যায়। তখন সকল টানাটানির সমাপ্তি হয়ে যাবে যে।

তাই দুঃখের কখনও শেষ হবে না। কারও দুঃখ শেষ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু জগতের দুঃখ কদাপি শেষ হবে না। জগৎ থেকে দুঃখ গেল তো সব গেল।

আমাদের জীবনে কত পর্যায়। এক রকমের পর্যায় তো নয়। হিসেব তো একটা নয়। যত রকমের হিসেব তত রকমের পর্যায়।

দুঃখের অবসান ঘটাতে আমার ব্যাকুলতা যেমন ভাবে সত্য, দুঃখের উদ্বেলনে দুনিয়ার তরঙ্গ রঙ্গ দেখে অবাক হয়ে ব'সে আছি—এ কথাও তেমন সত্য। দেখছি আর অবাক হয়ে যাচ্ছি। আমার এই অবাক হওয়াটাও কি একটা আশ্চর্য সত্য নয়?

শেষ কোথা? শেষ কোথাও নেই। অবাক হওয়া ব্যাপারটার মধ্যেও শেষ তো কোথাও পাচ্ছি না।

শুধু অবাক, শুধু অবাক। অবাকের পরে আরো আরো অবাক। আরো আরো আরো।

পরিচ্ছেদ—১৯

এবারে নিজের গল্প বলি। কি যেন বলছিলুম। গোড়ার দিকের কথায় চ'লে যাই। সেই প্রথম দিকের কথা যখন আমার বয়স পনেরো, ষোলো কি সতেরো। গিয়েছি শচীবাবুর বাড়ীতে অর্থাৎ শচীকান্ত ঘোষ মহাশয়ের বাড়ীতে। সেই যুগে শচীবাবু আনন্দময়ী মা সম্পর্কে একজন প্রধান ব্যক্তি। তার বাড়ীতে গিয়ে দেখি বিমলা মায়ের ছবি। আড্ডাপীঠের বিমলা মা। বেশ বড় ভাল ক'রে বাঁধানো বিমলা মায়ের ছবি। বিমলা মায়ের ছবি রয়েছে শচীবাবুর ঘরে। শচীবাবুর মুখে কত ভাল ভাল কথা শুনতে পেয়েছি সেই সময়। শচীবাবুর স্ত্রী অনেকদিন আগেই গত হয়েছেন। আমি আর তাকে দেখতে পাই নি।

শচীবাবুর একজন মেজদি ছিলেন। বিধবা মহিলা খুব শুদ্ধ সাত্ত্বিক ভাবে জীবন যাপন করতেন। সেই প্রথম প্রথম মা আনন্দময়ীর কাছে গিয়ে আমি যখন আবদার ধরতুম, আমি অব্রাহ্মণের হাতে খাব তখন মা বলতেন, আচ্ছা তুই শচীবাবুর বোনের হাতে খেতে পারিস।

আর একটা গল্প বলি। মায়ের মুখেই শুনেছি শচীবাবুর বোন অর্থাৎ সেই মেজদির না কি খুব বড় বড় চুল ছিল। সেই চুল আমরাও দেখেছি। মা বলতেন, মেজদির স্বামী কখনও কখনও গরমের দিনে ক্লান্ত হয়ে এলে মেজদি তাঁর লম্বা চুল পেতে দিতেন তাঁর স্বামীকে শোওয়ার জন্য। ঘটনা কিছুই নয়। তবু মেজদির চিত্র এতে প্রকাশ পাবে। আর প্রকাশ পাবে মায়ের বলবার ভঙ্গীটি। স্বামীসেবা পরায়ণা এক মহিলাকে মা কি রকম appreciate করতেন সে কথাও যেন পরিস্ফুট হয়ে উঠত।

তথাকথিত স্বামীসেবা জিনিসটা আমি যে খুব বুঝতে পারি তা নয়।

বুঝতেও পারি না, খুব একটা ভাল চোখেও দেখি না। আমি মনে করি, স্ত্রী স্বামীকে যে রকম শ্রদ্ধার চোখে দেখবে স্বামীও স্ত্রীকে সেরকম শ্রদ্ধার চোখে দেখবে অথবা দেখা উচিত।

ছেলেবেলায় দেখতুম চিরুণীতে লেখা আছে পতি পরম গুরু। আমি ভাবি কেন, কিসের জন্য। স্বামী স্ত্রীব পক্ষে পরম গুরু হ'তে গেলেন কোন্ হিসেবে?

সতীদাহ ব'লে একটা কথা আছে। এখনও কোথাও কোথাও সতীদাহ হয়। আমার একটি কন্যা বলেছে সতীদাহ হয়, পতিদাহ হয় না কেন? সতীর দেহত্যাগ হ'লে সতীর চিতার পার্শ্বে পতিটিকে জবরদস্তি চাপিযে দিয়ে, ঢাক ঢোল বাজিয়ে পতি দেবতার মুখে আগুন লাগিয়ে দেওয়া—এই জিনিস কি একটা বিসদৃশ ব্যাপার? কি অপূর্ব সমাজ। জোর যার মুলুক তার। আমাব মনের এই খেদ কবে যে মিটবে এবং কেমন ক'রে মিটবে সে আমি বলতে পাবি না।

ভগবান দুটো ভাগ করেছেন। মেয়ে এবং পুরুষ। খুব ভাল কথা। এর মধ্যে জোর জবরদস্তির কি ব্যাপার আছে। একদিক দিয়ে পুরুষরা ahead, আর এক দিক মেয়েরা এ তো দেখাই যাচ্ছে। কোনো কোনো বিষয়ে আগে পুরুষেরা অগ্রসর ছিল। এখন মেয়েরা সমানে তাল দিচ্ছে এটাও প্রত্যক্ষ।

এখন ব্যাপার হয়েছে এই, মেয়েদের যদি জোব ক'রে দাবিয়ে দেওয়া যায় তারা মাথা তোলবার একটা না একটা পথ ক'রে নেবে। করবেই। করাই তো স্বাভাবিক।

সোজা পথে না হ'লে ছলে বলে অথবা কৌশলে। এই যে একটা কথা প্রচলিত আছে, মেয়েদের ছল চাতুরী বেশী। আমি বলব এটা তো একেবারেই স্বাভাবিক। মেয়েরা এগিয়ে যাবে না? চেষ্টা করবে না? সবাইকে নিজের আয়ত্বের মধ্যে রাখা কে না চায়।

পুরুষদের কত কায়দা। আহা মরি কত-না চেষ্টা। বই লেখা তো

আছেই। যে কোনো একটা বক্তব্য সংস্কৃতে লিখলেই হ'ল। বাস্ সাত খুন মাপ্। তার ওপোরে আর একটা কথা আছে।

Psychology অর্থাৎ মনস্তত্ত্বের উপর ভর ক'রে চালাকের দল কাজ করেছে। একটা মেয়েকে প্রথম থেকেই—একেবারে শিশুকাল থেকেই বলা হচ্ছে পতি পরম দেবতা। মেয়েদের পক্ষে পতিসেবাই জীবনের চরম সার্থকতা। পতির পূজোতেই সকল দেবতার পূজা হয়। পতির সন্তুষ্টি বিধান করতে পারলেই বাস্ আর কিছুই চাই না। লিখতে লিখতে, বলতে বলতে, এবং মেয়েদের পক্ষে ভাবতে ভাবতে এ কথাটা একটা মস্ত আকার নিয়েছে। ফলে সমাজে এসেছে একটা বিকৃত রূপ। প্রতিক্রিয়া আপনিই দেখা দিয়েছে। আজ দেখা দেয়নি। অনেক দিন ধ'রেই। এই নিয়ে কত গল্প, কত উপন্যাস, কত কথা। এই ভারতবর্ষে পৌরাণিক চরিত্রগুণাকেও এই ছাঁদেই দাঁড় করানো হয়েছে। এর মধ্যে যে ভাল জিনিস একেবারে নেই তা নয়। কে বলে এর মধ্যে মঙ্গল নেই? মঙ্গল কিছু আছে তো বটেই। মঙ্গল কিছু আছে তো বটে কিন্তু ঢের পরিমাণে নেই। অর্থাৎ বলতে চাই, মঙ্গলের প্রাচুর্য নেই।

আমার তো মনে হয় মেয়েদের কষ্টে এই ভারতবর্ষের হাওয়া নষ্ট এবং মেয়েদের চোখের জলে এখানকার মাটি সিক্ত। এখনও মাটিতে কান পাতলে বুঝি মেয়েদের কান্না শুনতে পাওয়া যায়।

এবারে আর এক কথায় আসি। কথাটাকে পরিষ্কার করার চেষ্টা করছি। সংস্কার। সংস্কার। সংস্কার। ছিল একটা প্রবল ইচ্ছা। দেহগত, মনোগত এবং বুদ্ধিগত একটা চাহিদা। সেই চাহিদাকে প্রবল ক'রে তোলা হয়েছে। অন্তরের সেই ইচ্ছাই আজকে সংস্কারে রূপ নিয়েছে। ছেলেদের শারীরিক জোর অনেক বেশী। সেই কারণে তারা মাথা তুলেছে অনেক বেশী অন্তত এই দেশে। সকল দেশে একরকম নয় কিন্তু। বার্মা ইত্যাদি অনেক দেশে—আমাদের হিমালয়ের কোনো কোনো অঞ্চলে সিকিম, তিব্বত ইত্যাদি স্থানে মেয়েদের অর্থাৎ মায়েদের প্রভাব এবং দাপট সুবিদিত।

আবার আসাম অঞ্চলে কোনো কোনো স্থানে শুনেছি মেয়েরা ছেলেদের ইচ্ছেমত ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায়। এক এক দেশে এক এক রকম।

মেয়েরা আগে কি মেয়েরা পাছে এ কথা বলতে পারি না। মেয়েরা ওপরে কী মেয়েরা নীচে তাও বলতে পারি না। তবে চোখের দেখা দেখতে পাই, নাম করা লোকেদের মধ্যে ছেলেদের সংখ্যাই বেশী— অনেক বেশী।

তবে এর দ্বারা একটা কিছু সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যায় না। লাইন টেনে একটা পাকা কথা বলতে পারি না।

ছেলেরা তো যা করেছে করেইছে। সবাই বলে, সবাই জানে। কিন্তু মেয়েরা কি করছে, কি করেছে কেউ ভাবে কি? ঠিক সেই দিক দিয়ে কেউ ভাবে না।

লোকে কত গল্প লেখে, কত আলোচনা হয়, তথ্য এবং তত্ত্ব নিয়ে কত চচ্চড়ি রান্না হয় তার কোনো পরিমাপ নেই।

কিন্তু ওই জায়গাটা ছুঁয়ে কি কেউ লেখে? লিখবে না কেন? লেখে। তবে কমই লেখে। বেশী কথা হয় না। বেশী লেখা লেখে না। রাজা রামমোহন রায় লেখনী ধরেছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় ভেবেছিলেন এবং চোখের জল ফেলেছিলেন। সেই অনুসারে কাজও করেছিলেন।

আমি অন্য কথা ভাবি। আমি ভাবি দেশের অবস্থা এখনও ফিরল না। এখনও আমাদের মা বোনেরা, মাসি, পিসিরা প্রায় যে তিমিরে সেই তিমিরে। মেয়েরাও জাগবে, উঠবে, দেখবে, বুঝবে, বোঝাবে তবে তো আনন্দ হবে—তবে তো সমস্ত সংসার সুখের সংসার হয়ে উঠবে— তবে তো সারা দুনিয়া দাক্ষিণ্যের দোলায় দুলবে। এই হ'ল গিয়ে আমার চিন্তা, আমার কথা। প্রসঙ্গটা ব'লে ব'লে শেষ হচ্ছে না। প্রসঙ্গটা যে অনেকখানি, অনেক দূর পর্যন্ত।

জগতে দুটি মূল শক্তি। মা শক্তি এবং বাবা শক্তি। এই দুটো শক্তি মিলে একটি শক্তি এবং সেইটেই আদি শক্তি। সেই আদি শক্তি দু ভাগে বিভক্ত। মেয়েরা এবং পুরুষরা। মায়েরা এবং বাবারা।

দুটোই কথা। এই দুইটি সীমা। মানুষের দুটি হাত। চব্বিশ ঘণ্টায় দুটি ছবি—রাত আর দিন। অথবা অন্ধকার আর আলোক। এ ভাবে দুই যেন নিত্যসিদ্ধ।

আবার দুই নিয়েই সংসার। এই রাজত্ব দুই এর রাজত্ব। আনন্দময়ী মায়ের মুখে শুনেছি দুই নিয়া দুনিয়া। শাস্ত্রে পাই দ্বিতীয়াদ্ বৈ ভয়ং ভবতি।

এই দুয়ের মধ্যে কে বড়। কালী বড় কি শিব বড়। শক্তি বড় কি শক্তিমান বড়।

সবাই জানে এই দুই এক। দুয়ে এক, একে দুই। কিন্তু যেখানে এক, সেখানে এক। যেখানে দুই, সেইখানে দুই।

যেখানে দুই, সেখানকার কথা এখানে বলছি। সেইখানে কে বড়। মা বড় কি বাবা বড়। আমি বলি, এই কথার কোনো মীমাংসা হয় না। মীমাংসা নেই তাই হয় না। কোনো স্থলে মায়েদের জিত, কোনো জায়গায় বাবাদের জিত।

এইখানে আমি আমার কথা কিছু বলব। শৌর্যে এবং বীর্যে, প্রতিভায় এবং ঔজ্জ্বল্যে, জ্ঞানে এবং ধ্যানে ছেলেরা যে বড় ওই কথা তো সবাই জানে। আবার দয়ায় এবং ক্ষমায়, মাধুর্যে এবং সৌন্দর্যে, আনন্দে এবং স্বাচ্ছন্দ্যে মেয়েরাই পুরোভাগে। ছেলেরা কত কি কত কি করেছে। মেয়েরা কত কি ভেবেছে এবং অনুভব করেছে।

ছেলেদের অসীম আকাশ, মেয়েদের আশ্চর্য বৈচিত্র্য। ছেলেরা আগে, মেয়েরা পিছে। আবার আমি দেখতে পাই মেয়েরা আগে ছেলেরা পিছে। আমি দেখতে পাচ্ছি মেয়েরাই সব ধ'রে আছে। বিশ্ব-সমাজটাকে মেয়েরাই চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কর্মকর্তা মেয়েরাই। মেয়েরাই জগতের কর্ত্রী এবং মেয়েরাই জগতের ধাত্রী।

বিধাত্রী এবং ধাত্রী। তাই বলি, মেয়েরাই তো সব কিছু। মেয়েরা কি নয়।

একটা বড় কাজ হ'ল। হয়তো বা নাম হ'ল ছেলেদের। অনেক সময় তাই হয়। এখন দিন কাল পালটে যাচ্ছে অবিশ্যি। তবু দেখতে পাই এবং শুনতে পাই ছেলেদের জয় জয়কার।

কিন্তু চোখ মেলে দেখো আর কান পেতে শোনো এবং মন দিয়ে অনুভব কর সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধির সাহায্যে বোঝো—মেয়েদের কী মহিমা। কী শক্তি, কী মহিমা। কী গরিমা। বাইরে প্রকাশ বেশী নেই, বাজারে সোরগোল কম। সভাতে হৈ-চৈ জিনিসের অভাব। কিন্তু মূল ধাক্কা মেয়েরাই সামলাচ্ছে। মূলে একটু ধাক্কা অথবা প্রেরণা মেয়েরাই তো দিচ্ছে।

লোকেরা বলে মেয়েরা মায়ের জাত। কিন্তু আমি বলি, মেয়েরা মায়ের জাত নয়, মেয়েরা মা স্বয়ং। সবই মা স্বয়ং। কিন্তু মেয়েরা মায়ের আশীর্বাদ। মা তো বটেই, তবু বলি, মেয়েরা জগজ্জননীর আশীর্বাদ।

যেমন দুধ পচলে খুব একটা বিচ্ছিরি গন্ধ বের হয় তেমন বিকৃত রূপ নিলে মেয়েরা হয়ে ওঠে অভিশাপ। আশীবাদ নয় অভিশাপ। কিন্তু মনে রাখতে হবে এই দিকটা বিকৃতি। চির সুকৃতি, হয়েছে বিকৃতি। সেই যে শুনেছিলুম এমনি আমি মাটির মানুষ, রাগলে আমি মুচির কুকুর। সেই কথাটা মনে প'ড়ে যায়।

মেয়েরা আসলে মা। যখন নকল রূপ নেয় তখন মায়া। মা হয়ে দাঁড়িয়েছেন মায়া। মা কোলে নেয়, মায়া পতন ঘটায়। মা সন্তানকে বড় করে। মায়া ছোট করে। মা ভাসায়, মায়া ডোবায়। মা হাসেন ভালবাসার হাসি। মায়াও হাসে। মায়া হাসে ছলনা এবং চাতুরীর হাসি।

এইভাবে খেলা চলেছে। খেলা চলেছে শুধু নয়, খেলা জমেছেও। মায়ের খেলা এবং মায়ার খেলা এই দুই খেলাতে আমি অবাক মেনে যাই। অবাক কাণ্ড। শুধু অবাক নয়। আমি যে হতবাক।

কিন্তু যখনই আমি ভাল ক'রে দেখি দেখতে পাই, যিনি মা তিনিই

মায়া। মা হয়েছেন মায়া। নহে নহে, মা সেজেছেন মায়া। মা হয়েছেন, করেছেন এবং সেজেছেন।

অন্য কিছু নেই। মা ছাড়া অন্য কিছু নেই। শুধু মা, শুধু মা। শুধু মায়ের বৈচিত্র্য।

শুধু বৈচিত্র্য। কার বৈচিত্র্য জানি না। মায়ের কি বাবার কি ব্রহ্মের কি অন্য কোনো পদার্থের এই বৈচিত্র্য সে কথা আমি বলতে পারি না। কৃষ্ণের কি রামেরও হ'তে পারে। কিন্তু বৈচিত্র্য আর বৈচিত্র্য। বিশ্ব ভ'রে কেবল বৈচিত্র্য। কার বৈচিত্র্য কে জানে।

বৈচিত্র্য অথবা বলা যায় বৈশিষ্ট্য। বৈচিত্র্য, বৈশিষ্ট্য অথবা বলা যায় বৈলক্ষণ্য। আর এক দিক দিয়ে বলা যায়- বৈভব। কার বৈভব? সেই একজনেরই বৈভব। অথবা সেই মায়েরই বৈভব।

কথা অনেক। অনেক বিকাশ, অনেক প্রকাশ। অনেক রকমে সাজানো যায়। একটা ঘটনাকেই সাজাচ্ছি কিন্তু। একজনকেই সাজিয়ে তুলছি।

আমার মাকে সাজাচ্ছি। আমার ছেলেকে আমি সাজাচ্ছি। আমার প্রভুকে আমি সাজাচ্ছি। আমার বন্ধুকেই আমি সাজাচ্ছি। সাজাচ্ছি আর সাজাচ্ছি। অথবা সাজানো জিনিসকে আমি দেখছি আর দেখছি। এই কথা এইবারে এইখানে এখনকার মত শেষ করি। শেষ কি হয়? শেষ হয় না। অশেষ যে। তবু আমি শেষ করছি। অন্য এক প্রসঙ্গে যাব।

পরিচ্ছেদ—২০

আমি ছিলুম তখন দিল্লীতে। খেই ধরেছি, আমার জীবন-কথা কিছু ব'লে যাই—এই প্রসঙ্গে। আমি আছি অমল সেন মশায়ের বাগানে

একটা গরে। সত্যি কথা বলতে কি ঘরে নয় গ্যারেজ ঘরে। ঠিক কথাই তো। গ্যারেজ-এ গাড়ী থাকে। আমিও গাড়ী বই নয়। গড়গড়িয়ে চলছি। বাস করি গ্যারেজে। আমাতে চ'ড়ে অনেকে যাচ্ছে দূরে দূরান্তরে। আরও হয়তো অনেকে যাবে-।

তাই বলছিলুম, অমল সেন মশায়ের গ্যারেজে আমি তখন থাকি— একটি গাড়ী।

থাক্। নকশা করা বাদ দিয়ে বলি, দিল্লীতে অর্থাৎ কি না নিউ দিল্লীতে আমি আছি তখন তিন বছরের জন্য। কত লোক আমার কাছে যাতায়াত করেন। নানা ভাবে পরামর্শ দেন। নানা প্রকারে আমার কাজ এগিয়ে দেন। কিন্তু আমার কাজ আমি ক'রে চলি। বাইরের দিকে চলে আমার কীর্তন, পাঠ, গান শেখানো এই সব।

অমল সেন মশায়ের স্ত্রী—আমি দিদি ডাকতুম--কি একটা উপলক্ষ্যে আমাকে দিলেন এক সেট রামকৃষ্ণ কথামৃত। এই কথা আমি আগেই উল্লেখ করেছি। দিদিদের বাগানটা এক বিরাট সৌন্দর্য। গাছে গাছে অপরূপ। গভর্ণমেণ্ট প্রেস অঞ্চল। চারিদিক নিস্তব্ধ। শান্ত মধুর। নিউ দিল্লীর একটি মনোরম অংশ। একথা বোধহয় আগেও বলেছি—যত শহর আমি দেখেছি তার মধ্যে নিউ দিল্লীর তুলনা হয় না। ওল্ড দিল্লী অনেকটা কলিকাতার মত। কিন্তু নিউ দিল্লী যেন ছবিতে আঁকা।

একদিন অমলদা আমাকে একখানি ছোট্ট বই উপহার দিলেন। তার ঘরেতে রাখা পুরোনোই বই বটে। বইখানা ইংরীজী। আমার এখনও মনে পড়ে সবুজ রঙের মলাট। সাইজ অপেক্ষাকৃত ছোট সাইজ। বইখানার নাম The voice of Heaven. মনে পড়ে একজন ক্রীশ্চান বাঙালীর লেখা। অপূর্ব। নতুন ধরনের চিন্তা।

টুকরো টুকরো চিন্তা। আবার বই এর মধ্যে মুদ্রিত ছিল—এ সব তাঁর original thinking.

বইখানা আমাকে মুগ্ধ করেছিল। কিছুকাল বইখানা ছিল আমার

এক সুন্দর সঙ্গী।

তারপরে বইখানা কোথায় যে গেল। আমার বই এর ভিড়ের মধ্যে কোথাও হয়তো গা ঢাকা দিয়ে আছে। লুকোচুরি খেলছে। কি আর করি।

আমার জীবন-কথা লেখা চলেছে। এখন লিখছে আমার এক মা। দিল্লীর কথা চলছিল। কিন্তু দিল্লীর কথা লেখা হ'তে হ'তে আমার কাশীর একটা কথা মনে প'ড়ে গেল। কাশীতে নির্মলবাবুর বাড়ীতে আছি আমরা সবাই। মনে হয় আনন্দময়ী মাতাও আছেন। যেখানে আছি সেখানটা এক মুসলমান পল্লীর একটি পাশ। সে দিকটা খোলা নির্জন। অনেক গাছ গাছালি। আবার কাশীর রাস্তাও আছে। সরু গলি তেমন নেই। কিন্তু মাঝারি রাস্তা আছে। জায়গাটার নাম ঠিক মত মনে পড়ছে না। হঠাৎ মনে পড়ল রেউরিতলা।

বাড়ীটা নির্মলবাবুর বাড়ী। তখন আছে নির্মলবাবুর ছেলে বাচ্চু আর তার বিধবা মা। বাচ্চুর মা মাতা আনন্দময়ীর পরম ভক্ত, গুরুপ্রিয়া দেবীর বড় দিদি। তার নাম ছিল বজি। তিনি ছিলেন প্রসিদ্ধ মহাত্মা জিতেন ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য। জিতেন ঠাকুরকে আমি দেখেছি কয়েকবার বিভিন্ন স্থানে। তাঁর দিক থেকে প্রকাশিত বইও পড়েছি। রামকৃষ্ণ কথামৃতর ছাঁদে লেখা। বইখানা এমনি মন্দ নয়। তবে আমার কি রকম কি রকম লাগত।

মনে হ'ত রামকৃষ্ণ দেবের একটি নকল বেরিয়েছে। আর ফটোতে দেখতুম ঠিক সেরকম গলায় কাপড় দিয়ে বসা। তাঁর পাশে তাঁর সহধর্মিণী। যেমন রামকৃষ্ণ দেবের পাশে সারদা মা। এতে দোষের কিছুই নেই। তবে নকল ছবি দেখলেই আমার মনে একটা প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয়।

শুনেছি বা পড়েছি, জিতেন ঠাকুর মহাশয় খুব তপস্বী ছিলেন। তাঁকে প্রণাম করছি।

তাঁদের কথা যখন উঠল তাঁদের গল্প একটু করি। অল্প একটু করি। জিতেন ঠাকুর ছিলেন নিরীহ মানুষ এবং ভাল মানুষ। তিনি হয়তো ছিলেন বড় সাধক। কিন্তু অন্য জনেরা গুরুভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাতে গিয়ে তাঁকে ক'রে তুলেছেন তাঁদের মত।

এই যুগটাই বলা যায় শ্রীরামকৃষ্ণের যুগ। আবার বিবেকানন্দের যুগ। অন্তত বাঙালী সমাজের একটা স্তরে। বাস্তবিকই শ্রীরামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দ এই যুগের যুগদেবতা। তাঁদের প্রভাব বহুদূর পর্যন্ত গিয়ে পড়েছে।

কলিকাতায় আমি যে ঘরে থাকি সেই ঘরে একটা স্থানে জড় করেছি রামকৃষ্ণদেব সংক্রান্ত কত বই, কত বই। আমি যা পেয়েছি সে সব এক জায়গায় করেছি। তাঁদের যে সব-বই আছে তা না। অনেক বই আছে।

জিতেন ঠাকুরের প্রসঙ্গ চলছিল। জিতেন ঠাকুরের এক কন্যা অর্থাৎ শিষ্যা আমাদের সঙ্গে অনেক দিনের পরিচিতা। অনেক অনেক বছরের। একবার মনে পড়ে আলমোড়াতে তাঁকে অথবা তাঁদেরকে দেখতুম মাতা আনন্দময়ীর কাছে। কমলাদি ব'লে ডাকতাম। অনেক পরে কাশীতেও কমলাদির দেখা পেয়েছি। তাঁর গায়ে থাকত একটা গেরুয়া অথবা কমলা রঙের চাদর।

আমাদের এই কমলা দিদিকে আমার বেশ ভালোই লাগত। সর্বদা প্রসন্ন এবং আনন্দময়ী মূর্তি। তবে তেমন একটা গভীরতা আমি দেখতে পাই নি।

পরিচ্ছেদ—২১

আমার জীবনের আর একটি কাহিনী বলছি। আমাকে এবং গুরু-প্রিয়া দেবীকে নিয়ে মা আনন্দময়ী তখন ছিলেন মধ্য প্রদেশের এক জঙ্গলের

মধ্যে। সাগর সিটির নিকটবর্ত্তী সেই জঙ্গল।

সাগর সিটি অথবা সাগর মধ্য প্রদেশের একটি ছোটখাট শহর। জায়গাটা কিঞ্চিৎ পাহাড়িয়া জায়গা। পাহাড় বেশী উঁচু নয় কিন্তু। যেখানকার কথা বলছি সেখানে একটা বিরাট ঢাল রয়েছে। পাহাড়ের গায়ে সেই ঢাল। সেই ঢাল বেয়ে অনেকখানি নেমে আসলে তবে নীচেকার সমতল ভূমিতে আসা যায়।

জায়গাটা এই ধরনের। সেখানে থাকেন পাহাড়ের উপরের দিকে নেপাল রাজের এক রাণী। রাণী মাতার সেখানে বাসস্থান। সাগর সিটির এটি একটি অঞ্চল। এইখান থেকে নয় মাইল দূরে নিতান্ত এক জঙ্গলের মধ্যে নেপাল রাণীর একটি বাড়ী ছিল। ছোট্ট একটি বাংলো ধবনের বাড়ী। মাতা আনন্দময়ী সেই বাড়ীতে মাসখানেকের মত ছিলেন। কেবলমাত্র আমাদের দুজনকে সঙ্গে নিয়ে। আমি আর গুরুপ্রিয়া দেবী। নাম গুরু-প্রিয়া, নাম খুকুনিও বটে। মা ডাকতেন খুকুনি ব'লে। সকলের কাছে তিনি দিদি ব'লেই পরিচিত। মায়ের দিকের সমস্ত ব্যবহারিক দিকটাই ছিল তখন দিদির হাতে। টাকা পয়সা দিদির হাতেই। রান্নাবাড়ি দিদির হাতে। মায়েব কাপড়চোপড়ের দিকটা দিদিরই হাতে।

দিদির দুটো দিক ছিল। একটা দিক কঠোরতার দিক। সেদিকটাতে স্নিগ্ধ শ্যামল দিকটা বড় বেশী দেখা যেত না। যেন পুলিশবাহিনীর এক অধিপতি।

কিন্তু আর একটা দিকও ছিল। সেই দিকটা থাকত তলায় তলায় অথবা পিছনে পিছনে। কোনো বিশেষ মুহূর্তে সেই দিকটা প্রকাশ পেয়ে যেত। আমাদের দিদির চরিত্রে আমরা দেখতে পেতুম এই দুই ভাবের এক বিচিত্র সম্মেলন।

মাকে—আনন্দময়ী মাতাকে দিদি ভালবাসতেন প্রাণ দিয়ে। এরকম একটা ভালবাসা এই বিচিত্র সংসার জগতে বড় বেশী চোখে পড়ে না। দিদির ভালবাসার সঙ্গে ছিল দিদির ভক্তির ভাব। মাকে দিদি যেমন

অন্তর দিয়ে ভালবাসতেন তেমন আবার জীবনের তুঙ্গে বসিয়েছিলেন। কিন্তু লোকের কাছে দিদির সব দিকটা সহসা ধরা পড়ত না। এর কারণ, অতি সাধারণ মামুলী মানুষ দিদির কাছে প্রায়ই পৌঁছতে পারত না।

সমস্ত জীবন একরকম দিদি মাকে নিয়েই কাটিয়ে গেছে। দিদির আত্মীয় স্বজনের মধ্যে অনেকে ছিলেন যারা তথাকথিত বড়লোক অথবা বিশেষ লোক। বিশেষ লোকের দিকে — ধনী ব্যক্তিদের উপরে — নাম-জাদা ব্যক্তিদের সম্বন্ধে দিদির ছিল কিঞ্চিৎ দুর্বলতা। অন্তত আমার এই রকম মনে হয়। দিদিকে এক আধবার বলতে শুনেছি — কাজ অনুপাতে আমার নাম হয় না। অর্থাৎ আমি স্বীকৃতি পাই না।

আমার জীবনের একটা অংশে আমি দিদিকে পেয়েছিলাম। যেহেতু মা আমাকে অত্যন্ত রকমের স্নেহ করতেন অথবা ভালবাসতেন সেই হেতু দিদিও আমার দিকে বিশেষ দৃষ্টিতে দৃষ্টিপাত করতেন। দিদির লক্ষ্যটা ছিল মায়েরই দিকে। শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর বহুতর ভক্ত আমি দেখেছি। কিন্তু দিদির মত এই রকম একনিষ্ঠ নিতান্ত ভক্ত আমার চোখেই পড়েনি।

মা যেমন আমার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিলেন দিদিও তেমন কিছুটা আমার কাছে এসে গিয়েছিলেন আপনা আপনি। এ তো হবারই কথা। কিন্তু আমার জীবনের পরম লক্ষ্য ছিল সেই পরম বস্তু অথবা পরম দেবতা।

কিন্তু কোনো একটি রূপে আমি কোনো দিন বাঁধা প'ড়ে যাই নি। কোনো একজন দেব অথবা দেবীর মূর্তি আমাকে একেবারে আত্মসাৎ ক'রে ফেলে নি।

আমার ভাবের বিকাশ হয়েছে ধীরে ধীরে, স্তরে স্তরে, যুগে যুগে আমারই মধ্যে। শুধু মনে হয় কত যে কাণ্ড, কি যে বিচিত্র কাহিনী।

আমার জীবনের একটা যুগের মানুষ আমাকে মা আনন্দময়ীর সঙ্গে জড়িয়ে ছাড়া ভাবতেই পারে না। এ তো স্বাভাবিক। তাদের পক্ষে এটা আশ্চর্য কিছুই নয়।

প্রথম কথা, মা আনন্দময়ীর সঙ্গে ছিলাম – একেবারে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে ছিলাম সাতটা বছর। কেউ যদি বলে, ও অর্থাৎ অভয় মায়ের একেবারে কোলে কোলে থাকত তাতেও কিছু বলবার নেই। একেবারেই ঠিক কথা। একটা সময়ে ছিলাম আমি ওই রকম। মায়ের প্রতি হাত জোড় ক'রে ভক্তিভাবে আমার তেমন কিছু ছিল না - বেশী কিছু ছিল না। যা কিছু ছিল সেটাও আমার নিজের ধরনের। আমার জীবনের দেবতার প্রতি আমি ছিলাম অনুরক্ত। তার প্রতি অনুরাগে আমি ছিলাম রাঙা।

পরিচ্ছেদ—২২

যতই করি যতই বলি, যেমন করি যেমন বলি আমি সর্বদাই একটু অন্যরকম। সাধারণ মানুষের সঙ্গে আমার মেলে না। কোনোদিন মেলে না।

বাইরে আমার দুটো চোখ, দুটো কান, দুটো হাত, দুটো পা। তথাপি আমি কিঞ্চিৎ অন্য রকম। হয়তো একটু বিশেষ ভাবেই অন্য রকম। আমি আমার মত। কারোর মত আমি নই। কারোর মত আমি হ'তেও চাই না। তবু আমি জানি, এখন জানি, ভাল ক'রেই জানি—আমি সকলের সঙ্গে এক হয়ে থাকতে চাই। প্রকৃত কথা এই, আমি যে সকলের সঙ্গেই এক। এক যে আমি হয়েই আছি। নতুন ক'রে এক হব কি রকম।

আমি এক সমস্ত মানুষের সঙ্গে — সমস্ত প্রাণীর সঙ্গে—এমন কি সমস্ত কিছুর সঙ্গে। সকলের সঙ্গে। সব্বাইকার সঙ্গে। সমস্ত জগতের সঙ্গে। সমস্ত ইতিহাসের সঙ্গে।

আসল কথা এই, আমার সঙ্গেই আমি এক হয়ে আছি। তিনটি কথা অথবা তিনটি বস্তু খুব প্রধান হয়ে জেগে থাকে। আমি, তুমি আর তিনি। এই

তিনটি কথাই আমার কথা। আমিই ভাবছি আমিই বলছি। আমিই জানতে পেরেছি।

আমার কথা আমি ব'লে যাচ্ছি। আমার কথা মানে তোমার কথা এবং তাঁর কথা। সেই একজনের কথা।

আমার কথা যেন বিচিত্রভাবে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। এই বিচ্ছুরণের আলো ছড়িয়ে পড়ছে। আমার কথা আমি ব'লেই চলি। আমার গান আমি গেয়েই যাই। আমার প্রাণের অনুভব আমার কাছে।

এখানে একটি কথা বলব। আমার জীবনের কথা। আমার জীবনের মধ্যে দেখা দিচ্ছে তিনটে জিনিস অর্থাৎ তিনটে সত্তা।

একথা বলতে পার তিনটি আমি। আমার আমি তিনটি সত্তায় শোভা পাচ্ছে। এসো একবার নজর ক'রে দেখা যাক। আমি কাকে বলছি। আমি নিজেকেই নিজে বলছি।

তিনটি আমার সত্তা। অর্থাৎ কিনা তিনটি আমি আমার কাছে দেখা দিয়েছে অথবা ধরা পড়েছে।

লোকে হয়তো দেখে না। অনেকেই বুঝতে পারে না। অন্য লোকে দেখবে কি ক'রে। অন্য লোকে আমার খবর জানবে কি ক'রে। অন্য লোকের জানবার তো কথা নয় এখন পর্যন্ত।

কিন্তু তাই ব'লে আমি কি বলব না? আমার কথা আমি বলব না? আমার কথা আমার ব'লে যাওয়াই ভাল। লোকে বুঝলে বুঝবে, না বুঝলে না বুঝবে। আমার আলাপ আমি ক'রেই যাব।

কথাটা এই রকম। প্রথম সত্তাতে আমি একটি নিতান্ত ঘরোয়া মানুষ। আমি যেমন আমি তেমন। এই যে আমি কথা বলছি, এই যে আমি খাচ্ছি দাচ্ছি এবং গল্প করছি, এই যে আমি হাসছি, এই যে আমি কখনও কষ্ট পাচ্ছি—এই সমস্ত আমার প্রথম সত্তায়। প্রথম সত্তাতে আমি এই রকম। এর চেয়ে বেশী কিছু না।

আমি লাফাচ্ছি, আবার আমি দৌড়ে বেড়াচ্ছি। আবার কখনও

আমি হেসে হচ্ছি কুটপাট।

কখনও গল্প জুড়ে দি জমজমাট। কখনও হয়ে পড়ি একেবারে আহ্লাদে আটখানা। এ সমস্তই আমার বাহিরের সত্তাতে। অর্থাৎ প্রথম ভূমিতে বলতে পার। এই ভূমিতে আমি এই রকম। এইখানেতে আমার চেহারা এই রকম।

কিন্তু এখানে তো শেষ নয়। আমার আর একটি সত্তা রয়েছে— অপেক্ষাকৃত বড় সত্তা। আমার সেই দ্বিতীয় সত্তা আমার প্রথম সত্তারই বড় সংস্করণ। কতটা বড়, কি-করম-কি সে কথা আমি কি বলব। সে কথা তোমরা বিবেচনা কর। তোমাদের হাতে ছেড়ে দিলুম। আমি আমার মত ক'রে একটুখানি বলছি। কিন্তু বিবেচনাটা তোমাদেরই কাছে।

আমার দ্বিতীয় সত্তায় আমি অনেক দূর পর্যন্ত চিন্তা করতে পারি। সেই চিন্তা অনুসারে কাজ ক'রেও থাকি। আমার চিন্তা এবং কাজ বেরিয়ে পড়ে নব নব যাত্রায়। কোথায় যাই কোথায় বা না যাই কতদূরে চ'লে যাই। কোথায় কোথায় গিয়ে কোথাকার সব কথা বলি। কেমন ক'রে যে বলি তা আমি নিজেই ভাল জানি না।

এই সত্তাতে ব'সে আমি গান লিখে যাই। গানের পরে গান আসে। তারপরে আরও গান আসে।

সমস্ত গানের সুর দেওয়া হয় না। তাতে কি? গানের সুর এসে না পৌঁছক গান তো এসে গেছে।

কখনও কখনও—কচিৎ কখনও কোনো একটা ইশারা থেকে গানের সুরটাকে আগেই বুঝে নি। তারপরে গান ধরা দেয়।

গান, গান আর গান। গান আসে কথাকে বহন ক'রে। বলা যায় কথার ঘাড়ে চ'ড়ে। আবার কথা যেন ঘোড়া। সেই ঘোড়ার পিঠে এসেছে এক বিচিত্রবেশী রাজকুমার। সেই রাজকুমার হলেন গান। একজন রাজকুমার নয়, শত শত— সহস্র সহস্র।

যারা এসেছে তারা কেউ সাধারণ সৈনিক নয়। তারা প্রত্যেকে রাজার

ছেলে। রাজার ছেলেরা আমার কাছে এসেছে গানের বেশে। তাদের নিয়ে আমার অনেকখানি সময় কেটে যায়।

গান লেখা হয়েছে আন্দাজ সাড়ে সাত হাজারের মত। অনেক দূর পর্যন্ত গোনা হয়েছিল। ইদানীং অনেকদিন গোনা হয় নি। গান আছে, গানের সঙ্গে কবিতাও আছে। দু লাইন, চার লাইনের কবিতা অনেকগুলো রয়েছে।

যেমন আমি গান ভালবাসি তেমন আমি কবিতা লিখতেও ভালবাসি। ঠিক গানের মত নয়। তবুও আমার প্রাণের কথা কবিতার ভিতর দিয়ে অভিব্যক্ত হয়। দু লাইন, চার লাইন বা ছ লাইন, আট লাইন দিয়ে একটা কবিতা লেখা আমার হিসেবে খুব একটা সহজ কাজ নয়। বলতে চাই অল্প কথায় কয়েকটা ভাবকে প্রকাশ করতে হয় ওই ভাবে। কবিতা তো লিখলেই হোলো না। কবিতার ভিতর দিয়ে নিটোল একটি ভাব স্বয়ং সম্পূর্ণ প্রকাশ পেলে তবে মনে হয় কিছু একটা বলতে পেরেছি। কবিতা সে দু লাইনেরই হোক আর ছ লাইনেরই হোক সম্পূর্ণ একটি কথাকে পরিষ্কার ভাবে তুলে ধরলে তবে গিয়ে এটি একটি কবিতা। কবিতার ভিতর দিয়ে কবির অন্তর বাইরে আত্মপ্রকাশ করে। তাই কবিতা মানে কবির একটি ভাব। অনেক সময় দশ লাইন লিখেও ভাবটা সম্পূর্ণ ফোটে না। আবার অনেক সময় ভাবটা দু লাইনেই সম্পূর্ণ ফুটে ওঠে।

কথাটা এই, আমি গানের অনুশীলন করি। আমার যা কিছু বেশীর ভাগই গান। তার কারণ এক কালে আমি ছিলাম গানের জগতের একটি মানুষ। এখনও আমি জীবনের মধ্যে অনুভব করি সে গানের স্পন্দন। আমি শুনে অবাক হই, রবীন্দ্রনাথ বলতেন আমার অন্য লেখা হয়তো কোনো এক সময়ে নিভে যাবে। কিন্তু গানের ভিতর দিয়ে আমি বেঁচে থাকব। তিনি যে সত্যই কবি। তিনি যে কবিদিগের গুরু। তাই তাঁর পক্ষে এরকম চিন্তা কিছুই আশ্চর্য নয়।

আমি আমার কথা বলছিলুম। এক রকম শিশুকাল থেকেই আমি

গান লিখি। তখন নিজের হাতে লিখতুম। তারপর দীর্ঘকাল নিজের হাতে লিখিনি। দীর্ঘকাল মানে সুদীর্ঘকাল। আমি নিজের হাতে লিখিনি প্রায় বার বছর। যখন এই লেখা হচ্ছে তখন বলছি সম্প্রতি আবার আমি লিখতে আরম্ভ করেছি।

আবার সেই কথা বলি। নিজে ইচ্ছে ক'রে কিন্তু এইসব একটি কাজও করিনি। অনেক রকমে বলা যায় আমি ব'লে থাকি—আমি ভেবে থাকি এবং ব'লে থাকি যিনি আমার মালিক তিনি একদা সহসা আমার লেখা বন্ধ ক'রে দিলেন। লেখা মানে রচনাশক্তি নয়, হাতের লেখা। বরঞ্চ বলতে হয় হাতের লেখা বন্ধ হওয়ার পরে আমার রচনাশক্তি হয়তো বেশী কাজ করতে লাগল। আমি সেই সময় অল্প সময়ের মধ্যে এক হাজার গান লিখে ফেললাম। এখনকার কথা বলছি না কিন্তু। তখনকার কথা বলছি।

কী এক আশ্চর্য ভাবের মধ্যে বাস করতাম। আমার দেহকে আশ্রয় ক'রে একজন অদ্ভুত সত্তা-শক্তি কাজ করতেন। যে কাজ তিনি করতেন তার মধ্যে একটি কাজ ছিল গানের পরে গান রচনা করা। গভীর রাত্রিতে বেশীর ভাগ গান রচনা হ'ত। রাত্রি একটা দুটো তিনটে আবার চারটে পাঁচটা এইসব সময়ে গানের রচনা আপনা আপনি চলতে থাকত।

সে এক আশ্চর্য জগতে বাস করতাম। সুখের জগৎ অথবা দুঃখের জগৎ সে কথা কিন্তু বলছি না। আমি যেন তখন বাধ্য গানের পরে গান লিখতে।

পরিচ্ছেদ—২৩

প্রথম কৈশোরে খান দু তিন গান রচনা ক'রেছিলাম। এ কথা মনে পড়ছে। একেবারে শুরু হয় দুখানা গান দিয়ে। সেখানেও আমার মনের

চিরকালকার ভাব প্রকাশ পেয়েছে। একখানি হরির গান, একখানি মায়ের গান।

একটি গল্প আমি হয়তো করেছি। পূর্ববঙ্গ থেকে তখনকার দিনে আমাদের আত্মীয়স্বজন যাঁরাই কলিকাতায় আসতেন তাঁরা প্রায় সবাই আমাদের বাড়ীতেই উঠতেন।

যাঁর কথা বললাম তিনিও উঠতেন। আমাদের শৈশবকাল থেকেই তাঁকে অনেক অনেকবার দেখেছি। গান তিনি ভালই গাইতে পারতেন। তাঁর কথা পূর্বেও এসেছে ব'লে মনে করি। নাম ছিল তাঁর মধুসূদন পাঠক। কাজও তিনি করতেন—পাঠকের কাজ। পৌরাণিক কিছু কাহিনী অবলম্বন ক'রে তিনি কথকতা করতেন। হয়তো সেজন্তেই তাঁদের উপাধি ছিল পাঠক।

প্রত্যেক বছর কলিকাতায় এসে গ্রে স্ট্রিট অঞ্চল থেকে ভবানীপুর অঞ্চলে অনায়াসে হেঁটে আসতেন। তারপরে কোথায় কি করতেন জানি না। একটু বেলার দিকে বাড়ীতে ফিরে আসতেন এবং খাওয়া দাওয়া করতেন। তিনি যখন কলিকাতায় থাকতেন তখন আমাদের বাড়ীর নারায়ণ পূজার ভার তাঁরই উপর ন্যস্ত থাকত। সম্পর্কে তিনি আমার পিতার বা পিতৃসদৃশ অন্যদের ঠাকুরদা ছিলেন। সেই জন্যই বাড়ীর অনেকে তাঁর সঙ্গে ঠাট্টা তামাশা খুব বেশী করত। পূর্বেই বলেছি এককালে আমাদের বাড়ীতে নিয়তই আনন্দের উৎসব চলত। সর্বদাই গান এবং বাজনা, সর্বদাই হাসি এবং গল্প, সর্বদাই সাহিত্য এবং অন্যান্য বিষয়ের চর্চা—এই ভাবেই সর্বদা একটা না একটা বিষয় আলোচিত হ'ত এবং অনুশীলিত হ'ত। আনুষঙ্গিক যা তা তো আছেই। বাইরের বহুজন অবাধে আমাদের বাড়ীতে বাস করতেন।

আমার এক জ্যাঠামশায়ের কথা মনে পড়ে। তিনি আমাকে খুব বেশী স্নেহ করতেন। একদিন তিনি শেষে কুম্ভ উপলক্ষ্যে হরিদ্বার যাত্রা করলেন। বাড়ীতে বাবাকে ব'লে গেলেন, আমি হয়তো আর ফিরব না। সাধু হয়ে

যাওয়ার ইচ্ছে।

হরিদ্বারে গিয়ে একটি স্থানে উঠে তিনি ডেরা পাতলেন, যেমন হয়ে থাকে। কিন্তু একদিন হঠাৎ সেখান থেকে একেবারে উধাও। সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন অনেক বই এবং কিছু কম্বলাদি। সে সমস্ত পরিত্যাগ ক'রে সঙ্গে কিছু মাত্র কিছু না নিয়ে তিনি একদা কোন্ অজানা পথে যাত্রা করলেন সে কথা আমরা বলতে পারি না। নাম তাঁর ছিল রেবতীমোহন। একদিন আমাদের এক পরিচিত আপনজন এসে খবর দিলে আমাদের সেই জ্যাঠামশাইকে হঠাৎ না কি দেখতে পেয়েছেন। দেখতে পেলেও তিনি আর আমাদের মধ্যে ফেরেন নি। তিনি চিরকালই ছিলেন দেখতাম - পথের মানুষ। পথের মানুষ পথেই কোথায় হারিয়ে গেলেন। তাঁর একটা পরিচয় আমরা কখনও বিস্মৃত হ'তে পারি না। তিনি ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। তাঁর লেখা প্রবন্ধ ইত্যাদি তখনকার দিনের একটি মাসিক পত্রিকায় অনেকবার বেরিয়েছে।

তাঁর সম্বন্ধে বহু কাহিনী আছে। একবার তিনি না কি চৌব্বাচার মধ্যে ঘটি ডোবাতে গিয়ে একটা জ্বলন্ত হারিকেন ডুবিয়ে দিয়েছিলেন। তার পরের কথা আর বললুম না। যা হবার তাই হ'ল। আমরা ডাকতুম তাঁকে জ্যাঠাপাগলা ব'লে। তিনি থাকতেন আমাদের বাড়ীর বৈঠকখানা ঘরে। রাত্রে না কি বই মাথায় দিয়ে শুতেন।

তারপরে আসছে আর একটি অধ্যায়। সে কথা বড় বিচিত্র কথা। তাঁর একটি ছেলে—তাঁর নাম তারাপদ ভট্টাচার্য—ছিলেন পাকা কমিউনিস্ট। মনে রাখতে হবে সেই যুগের কমিউনিস্ট। হয়তো ১৯২৬/২৭ সাল হবে। তারাপদ দাদাকে আমার কাকারা ডাকতেন পদা ব'লে। ঠিক কি কারণে জানি না। সেই তারাপদ দাদাকে গভর্ণমেণ্ট অনেক দিন অন্তরীণ ক'রে রেখেছিল সুখচরে। এটুকু মনে আছে আমার আত্মীয়েরা বলাবলি করতেন তারাপদ দাদা যখন অন্তরীণ অবস্থা থেকে বেরিয়ে এলেন তখন তাঁর স্বাস্থ্য খুবই ভাল হয়েছিল। অর্থাৎ তিনি বদ্ধ অবস্থাতেও খাওয়া দাওয়া খুবই

ভাল করতেন।

এই প্রসঙ্গে আর এক কথা এল। আমার মায়ের দুই মামা। এক রসময় ভট্টাচার্য। স্কটিশ চার্চ কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক। অন্যজন ছিলেন খেতুবাবু। তিনি ছিলেন ঘোর কমিউনিস্ট। ভাই বোন দুজনেই চূড়ান্তরূপে দেশ সেবায় নেমেছিলেন। কোন্ হিসেবে যে দেশ সেবা করতেন সে কথা এখন আমি কিছুই বলতে পারব না। এটুকু মনে আছে তাঁকে না কি হাওড়া স্টেশনে সরকারের পুলিশ একবার arrest করল। Arrest করবার সময় তাঁর সম্মুখে ধরল তাঁরই একখানা ফটোগ্রাফ। তাঁর হল জেল অথবা অন্তরীণ।

আমার দুই মামা। একজন এখনও বেঁচে আছেন। নাম পঞ্চানন ভট্টাচার্য। দুজনেই দেশের কাজ করেছেন। দুইজন দুই দিক দিয়ে। বড় মামা—যিনি এখনও জীবিত, লেখাপড়া করতেন বেশী রকম। কলেজী বিদ্যায় তিনি এম এ. পাশ করেছিলেন দুটো বিষয়ে। গল্প লিখতেন, আরও কি কি লিখতেন। একখানি দৈনিক পত্রিকার তিনি ছিলেন সম্পাদক। যতদূর মনে পড়ছে পত্রিকাটির নাম ছিল লোকসেবক।

আবার তিনি ছিলেন গানে, বাজনায় পারংগম। চারটে যন্ত্র তিনি ভালই বাজাতেন। এসরাজ, সেতার, বাঁশি এবং বাঁয়া তবলা। অথচ মামার বাড়ীতে হারমোনিয়ম ছিল না। অন্তত ছেলেবেলার থেকে আমি দেখিনি। পরেকার কথা বলতে পারব না।

আমার শিশুকালে নাম ডাক ছিল বড় মামারই বেশী। ছোট মামার তত ছিল না। পরে এইমাত্র শুনেছিলুম, ছোটমামা সত্যানন্দ ভট্টাচার্য বি. এ. পাশ করেছিলেন।

কিন্তু আরও পরের ঘটনা অন্যরকম। ছোট মামা তখন কলিকাতা করপোরেশনের কাউন্সিলার হয়েছেন। আবার এদিকে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির একজন সদস্য। কুমারটুলি পাড়াতে ক্রমে তাঁর নামে বিশেষ হৈ চৈ। ঘটনাও ঘটেছিল জবরদস্ত।

কুমারটুলি পাড়াতে ছিল কিছু অনুন্নত সম্প্রদায়ের বস্তিবাড়ি। সরকার চেয়েছিল এদের উৎখাত ক'রে দিতে। ক্ষতিপূরণ কি দেবে না দেবে সে কথা আমি এখন বলতে পারব না।

মোটের উপর কথাটা এই, উত্তর কলিকাতার বুকের উপর থেকে একদল মানুষকে সরকার তুলে দিতে চায়। সেই মানুষেরা অসহায়।

বহু পরে আমি শুনতে পেয়েছি, ছোটমামা সত্যানন্দ ভট্টাচার্য তখন জনসমক্ষে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, সরকার আমাকে আগে গুলি করুক, তারপর যেন গরীবদের তুলে দেয়।

এ সব কথা অনেক পরে আমার শোনা। কিন্তু মানুষ এই সব কাহিনী মনে ক'রে রেখেছে।

ছোটমামার হ'ল heart attack. কয়েকটি সন্তান রেখে তিনি আপনার পথে একদিন কোথায় চ'লে গেলেন।

দুই মামার কথা আমি এই কিছু কিছু বললাম। এবারে দুই মাসীর কথা। বড় মাসীমা থাকতেন হরি ঘোষ স্ট্রিটে। আমার মায়ের ছিলেন তিনি ছোট বোন। তার পরেও এক বোন ছিল।

মাসীমা আর মেসোমশাই হরি ঘোষ স্ট্রিটে বাস করতেন। তখনকার কালে প্রসিদ্ধ গায়ক ধীরেন দাস মহাশয়ের বাড়ির পাশেই। ধীরেন দাসের কণ্ঠে গান 'বাংলা মা তোর শ্যামল গায়ে বাদল ঝরে দিন রজনী'—লোকের মুখে মুখে ফিরত। ধীরেনবাবুর কণ্ঠ ছিল অতিশয় মিষ্টি। এক আধবার ধীরেন দাসের বাড়ীতেই বৈঠকখানা ঘরে আমার মেসোমশায় ছোটখাট সভা বসাতেন। আমরা সবাই যেতুম। আমার বাবার মামা—ঠাকুরমার ভ্রাতা সেই দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তিনিও এই সভাতে যোগদান করেছেন।

একদিন এইরকম একটি সভা চলছিল। স্থান হরিঘোষ স্ট্রিট। ধীরেন দাস মশাই-এর বাড়ী। কাল সন্ধ্যাবেলা। আসর জমজমাট। আমার গানের গুরু আমার মেসোমশায় শ্রীগঙ্গাপ্রসাদ ভট্টাচার্য—তাঁরই উদ্যোগ। তাঁর একটি ছাত্রী একখানি গান গাইলে। গানখানিও সুন্দর।

গান গাইলে যে মেয়েটি সেই মেয়েটিও বেশ সুশ্রী। বয়স তার ৮ থেকে ১০ এর মধ্যে হবে। গান হয়ে গেলে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ব'লে উঠলেন, দেখ মা তোমার গান শুনতে বেশ লেগেছে। কিন্তু সা, রে, গা, মা চিৎকার বেশি করবে না। আ, আ, আ, আ ক'রে বেশি চেঁচামেচি করলে অমন সুন্দর মুখখানা কেমন হয়ে যাবে সেটা কি বুঝতে পার? তাই বলছি, গান গাও ভাল কথা কিন্তু বিচ্ছিরি চেঁচামেচি করবে না। মুখে ভেংচি কেটে আ, আ, আ, আ ওটা কি একটা গান হ'ল। ওখানে গান কোথায়। সৌন্দর্য কোথায়। পূর্বেই বলেছি, দাদাবাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন শত শত সঙ্গীত রচয়িতা এবং অনেক বিষয়ে কুশলী। তাই এই কথা বলতে তাঁর আটকালো না। তিনি তাঁর কথা বলেছেন, ভালোই করেছেন। আমি এইখানে এই বিষয়ে চুপ ক'রে থাকি।

মেসোমশায় গঙ্গাপ্রসাদের কথা বলছিলাম। তিনি একটা বড় দোকানে কাজ করতেন বিডন স্কোয়ারের ঠিক সামনে চিৎপুর রোডের উপর। তারপরে কাজ ছেড়ে দিয়ে একেবারে সম্পূর্ণভাবে সঙ্গীতের জগতে প্রবেশ করেছিলেন।

আমাদের বাড়ীতে তাঁর ছিল অবাধ গতি। তিনি সেখানে আসতেন যখন তখন। মাসীমা থাকতেও আসতেন, মাসীমার হঠাৎ মৃত্যুর পরও তিনি আসতেন। পরে তিনি আর এক বিবাহ করেছিলেন।

আমার জীবনের সঙ্গে তাঁর একটা বড় রকমের যোগাযোগ আছে। সেই যোগাযোগটিকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সঙ্গীত জগতের যোগাযোগ। আমার সঙ্গীত জগতে এই গঙ্গাপ্রসাদ ভট্টাচার্য আমার সর্বপ্রথম গুরু। গানের জগতে তিনি প্রধান গুরু।

তাঁর কাছে প্রথম আমি খেয়াল শিখেছি কয়েক বৎসর। তখন তাঁর গুরু অর্থাৎ ওস্তাদ ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ মিত্র। লোকে বলত কেষ্ট মিত্তির। তাঁর গানের গুরু ছিলেন, স্বনামধন্য সঙ্গীত শিল্পী ওস্তাদ বদল খাঁ। আমার মাষ্টারমশায় অর্থাৎ আমার মেসোমশায় গঙ্গাপ্রসাদ ভট্টাচার্য গভীর শ্রদ্ধার

সঙ্গে তাঁর নাম উচ্চারণ করতেন। কিন্তু তিনি বলতেন, বাদল খাঁ।

বাদল খাঁ সাহেব যে কত বড় ওস্তাদ ছিলেন, সে কথা আমার ওস্তাদ গঙ্গাপ্রসাদজীর কাছে শুনেছিলাম বটে। কিন্তু মাঝখানে সে সব কথা একেবারে ডুবে গিয়েছিল। বাদল খাঁ সাহেবের কথা আর আমি কারও কাছেই শুনতাম না। পরিচিত মহল থেকে আমি অনেক দূরে গিয়ে পড়েছিলাম। সেখানেও নতুন পরিচয়ের একটা জগৎ গ'ড়ে উঠল। সেই জগৎটা এক বিচিত্র জগৎ।

সেই জগৎটাও নূতন থেকে আমার কাছে পুরাতন হয়ে উঠতে বেশি সময় নিল না। আমি অন্য এক জগতের মানুষ হয়ে গেলাম দেখতে দেখতে।

ওপার থেকে আমাকে ডাকছে। ওপারের হাতছানিতে আমি একেবারে ব্যাকুল হয়ে উঠলাম। বাড়ী থেকে পলায়ন করলাম। একবার নয়, একাধিক বার। পলায়ন করেছি অথবা চম্পট দিয়েছি এ কথা বোধ হয় তেমন খাটে না। আমি চ'লে গিয়েছি আমার আপন বাড়ীর টানে। আমার আপন দেশের আকর্ষণে। আমার আপন জনের ডাকে।

আমি চ'লে গিয়েছি অনেক দূর। ভিতরের জগতেও অনেক দূর, বাইরের জগতেও অনেক দূর। কোথায় কোথায় আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি। প্রথমের দিকে বলতে পার, মাতা আনন্দময়ীর কোলে কোলে আমি যেন বাস করতুম। এই ভাবে কেটে গেল কয়েকটা বৎসর। প্রথম খেপে সাত আটটা বৎসর।

দ্বিতীয় খেপে আমি আনন্দময়ী মাতার কাছে আবার গেলাম ১৯৬৩ সালের শেষে। দিন কেটে যায়, মাস কেটে যায়, বৎসর কেটে যায়। আগের খেপে ছিলাম মায়ের একেবারে সঙ্গে সঙ্গে। এই খেপে থেকেছি মায়ের কাছাকাছি। কখনও থাকতাম কাছাকাছি, কখনও মা দূরে চ'লে যেতেন তাঁর অন্যান্য আশ্রমে। মা আনন্দময়ীর তো ভারতবর্ষে দুটো একটা আশ্রম নয়। মায়ের আশ্রম তিরিশটারও বেশী। মা বেড়িয়ে বেড়াতেন

তাঁর আশ্রমে আপন ইচ্ছামত।

মা বলতেন, আমার খেয়ালে আমি ঘুরি। যেমন যেমন খেয়াল আসে তেমন তেমন চলি। 'ইচ্ছা' শব্দটা মা বড় একটা ব্যবহার করতেন না। মা বলতেন খেয়াল। মা চলতেন মায়ের খেয়াল মত।

সময়ে সময়ে আমি দেখতে পেতাম, আর পাঁচ জনের মত মা গুছিয়ে কাজ করতেন না। প্রথম দিকে দেখেছি হিসেব ক'রে মা চলতেনই না। যখন যেখানে হয় চ'লে যেতেন। এমনও হ'তে পারে, মায়ের একটা আপন হিসাব আছে। অন্যের হিসাব মা নেবেন কেন।

এক এক সময় মা এসে পড়তেন। মায়ের নিকটে সময় কাটত তখন। আবার মা চ'লে যেতেন। ঘুরে ঘুরে আসতেন, ঘুরে ঘুরে চ'লে যেতেন। মা যখন আসতেন তখন মায়ের কাছে থাকতাম বটে, তবে আগের মত অত কাছে নয়।

মায়ের আওতার মধ্যেই আছি। এক হিসাবে মায়ের কাছাকাছিই আছি। মাও সবসময় তদারক করছেন এবং খবর রাখছেন। মাসে মাসে টাকাও পাঠাচ্ছেন। ব্যবস্থাও মা ক'রে দিচ্ছেন।

কিন্তু আমার ঠিক মনের মত যে হয় তা নয়। আমার ইচ্ছেমত, আমার সুবিধেমত, আমার মনের মত আমার অবস্থান করা সকল সময়ে হয় না।

একটা অদ্ভুত অবস্থায় আমার দিন কেটেছে। দিন শুধু নয়, দিনের পরে দিন। মাসের পরে মাস। বৎসরের পরে বৎসর। একটা ঘোরের মধ্য দিয়ে যেন কেটে গেছে।

প্রথম দিক দিয়ে আমি ছিলুম কতকটা অসুস্থ। সেই অসুস্থতার মধ্যেও কে যেন আমাকে নিয়ে চলেছিল। কার ইঙ্গিতে যেন আমি চলতাম। ঘটনা সব ঘটত কি এক আশ্চর্য হিসাবের মধ্যে। কে যেন আমাকে কিছু ক'রে তুলতে চায়। কে যেন আমাকে কিছু একটা গ'ড়ে তুলতে চায়। আবার কে যেন আমার প্রাণকে ভ'রে তুলতে চায়।

কিন্তু ওই পর্যন্তই। ক'রে তোলাও হয় না, গ'ড়ে তোলাও হয় না, ভ'রে তোলাও হয় না। এই রকমটা চলছিল।

কিন্তু হয় না, হয় না ক'রেও আমি হয়ে উঠছিলাম। হয় না হয় না বলছি বটে, কিন্তু হয়। কেমন ক'রে যেন হওয়াটা এগিয়ে যায়। চুপচাপ ব'সে থাকলেও দেখেছি কাজ এগিয়ে যাচ্ছে। আসল কথা এই, চুপচাপ ব'সে থাকাতো অসম্ভব। শুধু আমার পক্ষে নয়, বিশ্বের প্রতিটি প্রাণীর পক্ষে একেবারে চুপচাপ ব'সে থাকা একেবারেই অসম্ভব।

বিশ্ব চলেছে, বিশ্বের প্রতিটি প্রাণী চলেছে। বড় প্রাণী চলেছে এবং ছোট প্রাণী চলেছে। সবাই চলেছে। একেবারে সবাই চলেছে। কেউ তো থেমে নেই। থেমে থাকবার হুকুম কারও উপর নেই। বিশ্রাম করবার হুকুমও নেই। ঘুমোবার হুকুমও নেই। শান্ত কেউ হ'তেই পারে না। শান্ত হওয়া অসম্ভব।

শান্ত হওয়াটা ঠিক নয় যে। অশান্ত কমলাকান্ত দিয়ে বলে গালা-গালি। অশান্তিটা যে মুখ্য কথা।

এই বিশ্বজগতের প্রধান বার্তাই অশান্তি। জগতের মূলেই এই অশান্তি। আকাশের স্বরূপটাকে একপাশে রেখে যদি কথা বলি, আমাকে বলতেই হবে — আকাশ ভরা অশান্তি। আকাশ ভরা অশান্তি, বাতাস ভরা অশান্তি, প্রান্তর ভরা অশান্তি, অন্তর ভরা অশান্তি, সাগর ভরা অশান্তি। মরুভূমিতে মরু ভরা অশান্তি। অশান্তি আর অশান্তি।

ঘরে অশান্তি, ঘরের কোণে অশান্তি, ঘরের বাইরে প্রাঙ্গণে অশান্তি। আবার পাড়ায় পাড়ায় অশান্তি। দেশে দেশে অশান্তি। কোথায় অশান্তি নয়। কখন অশান্তি নয়। সেই যুগে এবং এই যুগে — সকল যুগে শুধু একমাত্র বুলি অশান্তি। প্রাগৈতিহাসিক যুগেও অশান্তি। আবার ইতি-হাসের পাতায় পাতায় অশান্তি। আজকালও অশান্তি। এখনও অশান্তি।

মাঝখানে মাঝখানে একটু একটু সময় আসে, যখন অবস্থাটা হয় ঘুমিয়ে পড়বার মত। তারপরেই আবার ওঠা আবার পড়া। নাগরদোলা।

আমরা ঠিক নাগর নই, তবু আমরা নাগরদোলায় দুলছি। ঘুরপাক আর ঘুরপাক। চক্রবৎ পরিবর্তন্তে।

পরিচ্ছেদ—২৪

এ কিন্তু অনেক দিনের খেলা। মানে অনেক বছরের, অনেক যুগের। কবেকার খেলা কেউ জানে না। কাণ্ড যে প্রকাণ্ড কাণ্ড। বিরাট, বিশাল, বৃহৎ এক ব্যাপার। আগা নেই, পাছা নেই, কিছু নেই। আদি এবং অন্ত কোথায় যেন হারিয়ে গেছে।

এই ব্যাপারখানা সম্বন্ধে কোনো কিছুই বলবার জো নেই। ভাববারই জো নেই তো বলবার জো থাকবে কোত্থেকে। কেউ ভাবতেও পারে না, কেউ বলতেও পারে না। কেউ চিন্তা করতেও পারে না। কেউ বুঝতেও পারে না।

মনে অনেক কিছু হয়। মনে তো কত কি হয়। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখ দিকি। দেখবে সমস্তই গুলিয়ে গেছে। যার গুলোয় না, সে ব্যক্তি ধীর ব্যক্তি। হু, এক জনের ছাড়া বাকী সব্বাইকার ওই একই অবস্থা। সমস্তটাই ভেস্তে গেছে।

আবার দৃষ্টিটাকে গুটিয়ে ইতিহাসের দিকে নিয়ে আসি। ইতিহাসে লাইন চলেছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকি। কত যুগ, কত যুগ, কত যুগ। যুগের পরে যুগ চ'লে যায়। যেন সিনেমার ছবি চ'লে যাচ্ছে।

সময় ব'লে একটা জিনিস ব'য়ে চলেছে তর্‌তর্‌ ক'রে। একটা নদী যেন ব'য়ে চলেছে। একটা স্রোতের ধারা যেন চ'লে আসছে। আমিও তার সঙ্গে সঙ্গে চ'লে আসছি।

সময়টাকেও কেউ ধরতে পারল না অথবা বুঝে উঠতে পারল না।

আমাকেও তাই। আমি দাঁড়িয়ে দেখছি। কিন্তু আমাকে কে দেখছে? আমিই তো সবাইকে দেখছি। তবে আমায় কে দেখতে পায়। আমাকে বুঝি কেউ দেখে না। আমি দুনিয়াকে দেখি—আমি সকলকে দেখি—আমাকেও আমি দেখি। কিন্তু আমাকে আর কেউ দেখে না।

বিশ্ব ভ'রে আমার দেখতে পাওয়া। দেখছি আর দেখছি। দেখে যাচ্ছি। শুধু দেখে যাও। নিজেকে নিজে বলছি। শুধু দেখে যাও। তুমি দেখে যাও চাঁদ। বলবার কিছু নেই, কইবার কিছু নেই, সমালোচনা করবার কিছু নেই—শুধু তুমি দেখে যাও চাঁদ।

দেখবারও কিছু নেই। দেখবার যে কিছু নেই—এই কথাটাকেই তুমি চুপচাপ দেখে যাও দিকি।

বন্ধু, তুমি দেখে যাও। আপন, তুমি দেখে যাও। তাই বলছিলুম, দেখে যাও চাঁদ। না দেখলে তুমি তো এক জড় বস্তু। যে দেখতে পারে তার তো চেতনা আছে। দেখতে পাওয়া এবং দেখতে পারা—এ দুটোই বহু ভাগ্যে ঘটে। দেখা কি কম জিনিস গা? আমরা তো বেশীর ভাগই দেখবার ক্ষমতা রাখি না। প্রায়ই আমরা দেখেও দেখি না। এক হিসেবে আমাদের দেখা আছে কিন্তু সেই দেখা দেখাই নয়। আমরা চোখ থাকতেও কানা।

শুধু চোখের কথা বলছি কেন, আমরা কান থাকতেও বধির। প্রত্যেকটা ইন্দ্রিয় সম্বন্ধেই ওই কথা। সব কিছু থাকতেও আমরা সর্বহারা। আমাদের সব আছে অথচ কিছুই নাই।

কিছুই যে নেই এ কথাটাও আমাদের ভাল ক'রে জানা নেই। আমরা মনে করি আমাদের অনেক অনেক কিছু আছে। হয় তো মুখে বলি, কি আছে আমার—কিছুই নেই। মুখে বললে কি হবে, ধারণাটা তেমন একটা বদ্ধমূল নয়। এই বললাম কিছুই নেই, আবার বলছি—তা যাই বল বাপু একেবারে কিছু কি আর নেই। নেই নেই ক'রেও আমার কিছু আছে বই কি। আর কিছু থাক আর না থাক আমার একটি ছুটু

ছেলে আছে পাজির-পা-ঝাড়া। তাকে নিয়ে আমার ঝঞ্ঝাটের আর সীমা নেই। অস্থির হয়ে গেলাম মশাই, অস্থির হয়ে গেলাম। বাস্তবিকই আমার অবস্থা ব্যস্ত সমস্ত। সদাই ব্যস্ত সমস্ত।

এ কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে আমার নিজের কথা কিছু বলছি না। যে কোনো একজনের কথা বলছি।

আমার কথা দিয়ে আমি সবাইকার কথা বলছি। আমি আমার আত্মজীবনী অথবা আত্মকাহিনী রচনা করছি। আমার কথার মধ্যে অনেক কথা আসছে। বিশ্বজগতের সবাইকার সঙ্গেই আমার যে রয়েছে যোগাযোগ। তাই আমার কথায় সবাইকার কথা।

হঠাৎ মনে হয়, এ কেমন কথা। সবাইকার সঙ্গেই কি আপনার সত্যিকারের যোগাযোগ? দেশে, বিদেশে, দূর দেশে যেখানে যার কথাই তুলি, প্রত্যেকের সঙ্গে আপনি মশাই কেমন ক'রে যুক্ত?

হ্যাঁ, আমি যুক্ত। যা বলেছি তাই। সকলের সঙ্গেই—প্রত্যেকের সঙ্গেই—One and all—প্রত্যেকটি মানুষের সঙ্গে আমার নিবিড়তম সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধটি আমার বোধের বাইরে নয়, আমার বোধের মধ্যে।

একটু ধীরভাবে চিন্তা কর। সমস্ত জগৎ-টাকেই আমি আমার বোধের জগৎ ব'লে বুঝে নিয়েছি এবং মেনে নিয়েছি। আমার আর এক চোখ দিয়ে দেখতে পাই, এই সমগ্র বিশ্বটাই আমার নিজের মূর্তি। আমি নিজেই এই বিশ্বরূপে।

যখন আমি দেখতে পাই না তখন আমিই আমার চক্ষুকে আবৃত ক'রে দিয়েছি। আমার মুখকে আমিই ঢাকা দিয়ে বলি, কই আমি তো তেমন কিছু দেখতে পাচ্ছি না। দেখতে চাই না তাই দেখতে পাই না। যখন দেখতে চাই তখন দেখতে পাই। আর সত্যি কথা বলতে কি যেমন দেখতে চাই তেমন দেখতে পাই।

আসল কথা, আমাকেই আমি সাজাই। যেমন আমাকে রচনা করি আমি তেমন হয়ে যাই যে। যেমন করি তেমন হই। যেমন ক'রে চলেছি

তেমন হচ্ছি। আরও বলি, যেমন করেছিলাম তেমন হয়েছিলাম। এবং যেমন করিব তেমন হইব।

সমস্তটাই আমার কাণ্ড। আমার কাণ্ড মানে আমির কাণ্ড। আমির কাণ্ড মানে একটা বোধের কাণ্ড। একটা বোধ, একটা ধারণা, একটা চেতনা, একটা আলোর আশ্চর্যজনক ঝলক। সেই ঝলকের আলোকে আমার চোখের সামনে ভাসতে থাকে বিচিত্রতা। বিচিত্রতার পরে আবার বিচিত্রতা।

ঝলক যে বললাম—সে জিনিসটা কি? বলতে পার একটা glimpse. এই glimpse-টা সবসময়ে শুধু ক্ষণিকের নয়। অনেক সময় কিছুক্ষণেরও বটে। বিন্দুর পরে বিন্দু সাজিয়েছি। হয়ে গেল একটা সরল রেখা—straight line. বিন্দু দিয়েই সব তৈরি কিন্তু। বিন্দু দিয়ে এমন কি সিন্ধু। সরল রেখা, বক্র বেখা—যে কোনো প্রকারের রেখা ওই বিন্দুব পরে বিন্দু দিয়েই তৈরি। এমন কি সমগ্র সিন্ধুটাই বিন্দুর ছড়াছড়ি। এইভাবে বিন্দুর রাজত্ব।

পরিচ্ছেদ—২৫

এবারে গল্পে আসি। গল্পে মানে ইতিহাসে। আমার জীবনের ইতিহাসে। একদা আমরা ছিলাম রায়পুরে। মৌনীমাতাও তখন রায়পুরে। রায়পুর অনেক আছে। আমাদের এই রায়পুরটা দেরাদুনের নিকটবর্তী এক রায়পুর। দেরাদুন থেকে মাইল তিনেক দূরে কিষণপুর থেকে মাইল সাতেক। মনে পড়ে একটা short cut ছিল। খানাখন্দ পার হয়ে, গ্রামের রাস্তা বেয়ে যাওয়া যেত। সেই যুগে আমি বিশুদার সঙ্গে কিংবা অন্য কোনো দাদার সঙ্গে চ'লে গিয়েছি কতবার তার ঠিক নেই।

একেবারে প্রথম যুগে অর্থাৎ ১৯৩৭/১৯৩৮ সালে অথবা তার

কাছাকাছি। রায়পুরে যাতায়াত করতুম। আবার মায়ের সঙ্গেও ওখানে গিয়ে থাকতুম। সেবারে মৌনী মা আমাদের সঙ্গে আছেন। আমরা আনন্দে মা আনন্দময়ীকে কেন্দ্র ক'রে থাকি উল্লাসে, উচ্ছ্বাসে, মজায়। আমার মনের মধ্যে তখন দুটো ভাবই খেলা করত। একদিক দিয়ে আমি ঈশ্বরকে খুঁজি। ঈশ্বর কে, কি রকম, কোথায় থাকেন এ সকল কথা ভাল ক'রে বুঝি না। তবু তাঁকেই খুঁজি। বুঝি আর নাহি বুঝি আমি একজনায় খুঁজি।

এই যে কথাটা বললুম, এইটি চিরকাল আমার অন্তরের কথা। আমি সেই তাঁকেই খুঁজে ফিরছি। আজ খুঁজছি। কাল খুঁজেছি। পরশুও খুঁজেছি। বহু বৎসর খুঁজেছি। চিরকাল খুঁজেছি। এখনও খুঁজছি। পরেও খুঁজব। খুঁজে খুঁজেই যেন আমার জীবন শেষ হয়ে যায়।

এ একটা মস্ত বড় সার্থকতা। এই প্রাপ্তিই বড় একটা প্রাপ্তি। এইখানে গিয়েই কথা বুঝি একরকম শেষ হয়ে যায়।

কিছুকাল পূর্বে আমার কথা বলতে গিয়ে আমি কিছু আশ্চর্য কথা বলেছিলাম। আমি সেই একজনকে পেয়েছিও বটে, পাইনিও বটে, আবার পেতে পেতে চলেছি তাও বটে। এইরকম অনেক কিছু। সে যাক্। রায়পুরের কাহিনী বলতে গিয়ে আমার মনে প'ড়ে যায় মৌনীমাতার কথা। মৌনীমাতা এমন একটি মহিলা যিনি আমার জীবনে বেশ অনেকখানি জুড়ে বসেছিলেন। আমার জীবনে কত জনই তো এসেছে। মৌনীমাও এসেছেন। মৌনীমা কিন্তু, আমার জীবনটিকে অনেক অনেক দূর পর্যন্ত ছেয়ে ফেলেছিলেন। কি কি এই জীবন-কথার ভিতরে লেখা হয়েছে সে কথা আমার ভাল মনে নেই। এখন যা হয় লিখে যাই। লিখে যাই মানে আমি বলছি, আর আমার রাধুমা লিখছে।

রায়পুরের গল্প বলছিলাম। গল্প হ'লেও সত্যি। একদম সত্যি কথা। রায়পুরে মৌনীমা আমাদের সঙ্গেই ছিলেন সেইসময়। আমি আমার তালেই থাকতুম। ওরা সবাই থাকত ওদের তালে। ওদের কত

কাজ। ওদের বিরাট সংস্থা—বিরাট বাহিনী, বড় রকমের চালচলন।

এসব টের পেতুম, ওই পর্যন্তই। দেখতুম, শুনতুম। কথাও বলতুম। অর্থাৎ মন্তব্যও প্রকাশ করতুম। কিন্তু তেমন নয়। অল্পসল্প দু-একটা কথায় আমার মনকে আমি প্রকাশ করতুম।

কিন্তু আমার ক্ষেত্রে আমি অনেকখানি সহজভাবে আপনাকে নিয়ে আপনি বাস করতুম। আমার ক্ষেত্রে আমি কথা বলতুম না তা নয়। বরঞ্চ আমার আনন্দে অথবা আমার ছন্দে আমি অনেক কথা বলতুম। যেমন একটা পাঁচ বছরের ছেলে কথা ব'লে যায়, খানিকটা বোধ হয় সেই রকম।

মৌনীমা রায়পুর থেকে মেয়েদের বিত্তালয়ে চ'লে যাবেন। যাকে আমরা এখন বলি, আনন্দময়ী কন্যাপীঠ। তারই পূর্ব সংস্করণ তখন হরিদ্বারে। মৌনীমা সেখেনে গিয়ে কন্যাদের আবাসে তখন কিছুদিন থাকবেন।

আমি এদিকে ঠিক সেই সময়টাতে মৌনীমাকে ছেড়ে থাকতে পারি না। মৌনীমা যাচ্ছেন, আমিও যাব। মৌনীমা স্টেশনে গিয়ে রেলগাড়িতে চড়লেন, আমিও আর একটা কামরায় চড়লাম। অল্প শীতা আমার গায়ে একখানা কম্বল। আমার সঙ্গে সামান্যই জিনিসপত্র। মৌনীমা যাচ্ছেন, আমিও যাচ্ছি।

একটা আশ্চর্য কথা এই। আমার সঙ্গে যখন যে-কোনো ব্যক্তির ঘনিষ্ঠতা হয়েছে, প্রত্যেকেই অন্তরের বিকাশে কিছু-না-কিছু বিকশিত অথবা উন্নত।

এখেনে মৌনীমার কথা বলছিলুম। চোখের দৃষ্টিতে, ভাবে এবং ভঙ্গীতে, কথায় এবং বার্তায়, অন্তরের অভিজ্ঞতায় মৌনীমা একজন নিতান্ত কম পাত্র ছিলেন না। শেষের দিকে তিনি দুখানি বই লিখেছিলেন। একখানি—কণিকামালা। কণিকামালা নামক গ্রন্থটি অপরূপ এক গ্রন্থ। মৌনীমায়ের আপন অভিজ্ঞতার বর্ণনা। তীব্র বৈরাগ্য, অন্তরের ব্যাকুলতা

ইত্যাদির কাহিনী। কিছু কিছু অলৌকিকতাও আছে সেখানে।

কিন্তু শুনতে পাই, মৌনীমা তাঁর জীবনের শেষাংশে সার কথা সমস্তই প্রায় হারিয়ে বসেছিলেন। শুনতে পাই বটে, কিন্তু বুঝে উঠতে পারি না। এমনকি ওইসব কথা তেমন বিশ্বাসও হয় না। আমার কেবলই মনে হয়, এত ভাব, এত মানসিক সৌন্দর্য এবং ঐশ্বর্য—এ কখনও এত সহজে শেষ হয়ে যেতে পারে না। আমি বলি, এ কখনও শেষ হয়ে যাবার নয়। মৌনীমার ভিতরে যা দেখতে পেয়েছি, সে-জিনিস অনাদি-অনন্ত ভগবানের ঘরের জিনিস। সে কখনও ফালতু জিনিস হতেই পাবে না। তাকে নষ্ট করবে কে। উবে যাওয়ার, উড়ে যাওয়ার, প'চে গ'লে নষ্ট হয়ে যাবার মাল সে তো নয়। মৌনীমার জীবনে যা ছিল তা মাল নয়, মালা। ভগবানের গলায় পড়বার মালা।

আমি আমার অন্তরের বিশ্বাসের কথা বলছি। মৌনীমা আমার কাছে এসেছিলেন আকাশের একটি দেবী। মৌনীমা অসাধারণ। মৌনীমাকে সাধারণ ক'রে দেখবার ক্ষমতা আমার নেই।

রায়পুর থেকে বেলগাড়িতে ক'রে আমরা এসে পৌঁছুলুম হরিদ্বার। মৌনীমার সঙ্গে—আরও যেন কে কে ছিল তা আমার মনে নেই। আমরা গিয়ে পৌঁছুলুম মেয়েদের বাড়ীতে।

মেয়েদের বাড়ী। বেশ কয়েকজন মেয়ে থাকেন সেই বিদ্যালয় গৃহেতে। মৌনীমা গিয়েছেন। মৌনীমার তো যাওয়ারই কথা। মা আনন্দময়ীর খুব প্রিয় পাত্র তিনি। তিনি গিয়েছেন, এতে কারও কিছু বলবার নেই, চিন্তা করবারও নেই। কিন্তু আমি কেন? আমি সেখানে নিতান্তই অবান্তর। আমার যাওয়া একান্তই অর্থহীন। আমি গিয়েছি মৌনীমার টানে।

হরিদ্বারে প্রথম রাত্রি কাটল মেয়েদের স্কুলবাড়ির বাইরের অংশের একটা বারান্দায়। রাত্রে মশার কামড়ে ছট্‌ফট্‌ করতে লাগলুম অনেকটা রাত্রি ভর। একটা অদ্ভুত কথা আমার এখনও মনে আছে, মধ্য-রাত্রিতে

অথবা শেষ রাত্রিতে ঘুমের ঘোরে দেখতে পেলাম মৌনীমাকে। সেই সময়টাতে আমার অন্তরের কেন্দ্র-কোঠায় বিরাজ করতেন মৌনীমা। স্বপ্নেও তাই। সে কেমন ধারা স্বপ্ন বলতে পারি না—দেখতে পেলাম সেই মৌনীমাকে।

এটা কি আমার নিজের পথ থেকে স'রে যাওয়া? স'রেই যেন গিয়েছিলাম। আমি পূর্বেই বলেছি, মৌনীমা ছিলেন অসাধারণ। পরমার্থের দিক দিয়েই তিনি সমৃদ্ধ। তবু ভাবি, কেন আমি স'রে গিয়েছিলাম ক্ষণিকের তরে। কেন, কেন, কেন। একদিন দুইদিন নয়, বেশ কিছু দিন। সর্বশুদ্ধ কয়েকটা বৎসর হবে। অন্ততঃ তিন চারটে বৎসর তো হবেই।

তারপরে মৌনীমা কোথায় চ'লে গেলেন। পরে শুনতে পাই, মৌনীমা শেষ জীবনে কি রকম যেন হয়ে গিয়েছিলেন। আমার যেন মনে পড়ে, মৌনীমার দেহত্যাগের পর মা আনন্দময়ী তাঁর সম্বন্ধে অনেকের সামনে কত, কত কথাই বলতেন।

আমার কেমন ধারণা হয়েছিল মৌনীমা ব্রাহ্মণ ছিলেন। প্রকৃত ব্রাহ্মণ বলতে যে-স্তরকে আমরা বুঝে থাকি, মৌনীমা ছিলেন সেই স্তরে।

আমার উপলব্ধির সত্য বলছি। ব্রাহ্মণ কিন্তু এক জাতের নয়। অবশ্য প্রকৃত ব্রাহ্মণের কথা বলছি। প্রকৃত ব্রাহ্মণ হ'লেই যে একটি মাত্র ধারায় থাকবে তার কোনো মানে নেই। সেখানেও ধারা অনেক ধরনের। মৌনীমা ছিলেন তাঁর ধরনে একটি ব্রাহ্মণ। এখানে বংশগত ব্রাহ্মণের কথা বলিনি। এখানে গুণ এবং কর্ম অনুসারে যে-ব্রাহ্মণ সেই ব্রাহ্মণের কথাই বলছি।

মৌনীমা ছিলেন দত্ত পরিবারের একটি বধূ। আমাদের রাখাল দত্তের মা। রাখালদা দেশের কাজে জেলে ছিলেন ছ-ছটা বৎসর। জেলে গিয়েই —জেলে থাকতে থাকতেই তিনি এম. এ. পাশ করেন। স্বভাবে, চরিত্রে আবার জীবনের গভীর তাৎপর্যের দিক থেকে রাখালদা ছিলেন একটি

পুরুষের মত পুরুষ। এই রাখাল দত্তের ভগ্নী ছিলেন আমাদের রেনুদি। তিনি সংসারী নারী ছিলেন বটে, কিন্তু ছিলেন অত্যন্ত মাধুর্যময়ী।

এ-হেন মৌনীমার কথা বলতে চ'লেছি। ঠিক কি কারণ বলতে পারি না, মৌনীমা আমার জীবনের আকাশে সেই সময়টাতে অনেকটা যেন চন্দ্রমার ন্যায় বিরাজিত। সূর্য নয়, সাধারণ নক্ষত্রও নয়। ঠিক যেন চন্দ্রমা।

আমি এর পূর্বে কোন্ কোন্ কথা বলেছি, আর কোন্ কোন্ কথা বলিনি, সে-কথা ঠিক মনে করতে পারছি না। সেই পুরোনো কথাই আবার বলি, যেমন যেমন আমার মনেতে এসে পড়ছে, তেমন তেম্‌নি লিখে যাই। এখন আমি একটু আধটু লিখি বটে, তবে তেমন ধারা কিছু লিখি না। বা লিখতে পারি না। লেখা বন্ধ হয়েছে অনেকদিন। সেই কাশীতে। বছর পনের ষোল হয়তো হবে। আমার ডায়েরিতে আমার হাতের লেখা দেখে সে-কথা পরিষ্কার বোঝা যাবে। এখনও একটা বাক্সে সেইসব ডায়েরি রাখা আছে। বর্তমানে সেই বাক্সটা আছে শান্তিনিকেতনে। আর আমি কলকাতায় ব'সে আমার রাধুমাকে দিয়ে এই বইখানি লেখা করাচ্ছি। যখন যেখানে থাকি, সেইখানেই লেখা চলে।

মৌনীমার কথা চলছিল। আমার সঙ্গে মাতা আনন্দময়ীর সম্পর্ক ছিল একধরনের। সেখানে আমি আকৃষ্ট ছিলাম কতকটা বুদ্ধিগত ভাবে। সেখানেও ছিল বিষম আকর্ষণ। কিন্তু সেখানে হিসেবের জোর ছিল বেশী। আর, মৌনীমার ক্ষেত্রে আমার এসেছিল একটা স্বাভাবিক টান।

মৌনীমা ছিলেন রোগা মানুষ। একটু বেশী রোগা বলা যায়। কিন্তু মৌনীমার চোখে-মুখে ছিল একটা উন্নত ধরনের দীপ্তি। আমি যখন মৌনীমার কাছে আসি, তখন মৌনীমা ছিলেন গৈরিক বস্ত্রধারিণী। চুল খুব ছোটো না হ'লেও খানিকটা ছোটো।

আমার যেন মনে হয়, সেই যুগে, সেই সময়ে কতকটা পরমার্থের দৃষ্টি দিয়ে আমি মৌনীমাকে দেখতে শিখেছিলাম। মৌনীমা যে উন্নত আত্মা, মৌনীমা যে অসাধারণ কিছু—এই কথাটাই—তার সঙ্গে আরও যেন কিছু

আছে—এই কথাটাই আমাকে একটা সুগভীর আকর্ষণে আবদ্ধ ক'রে রাখত।

এইটা ছিল প্রধান কথা। আর কি ছিল ভাল ক'রে বলতে পারব না। এইটুকু বলতে পারি, আমার মনপ্রাণ একটা আশ্চর্য আকর্ষণ অনুভব করত মৌনীমায়ের দিকে।

মানুষের মন এক আশ্চর্য জিনিস। মানুষ অনেক দূর পর্যন্ত হিসেব করতে পারে। কিন্তু আপন মনের হিসেব করা তার সাধ্যের বাইরে।

আমি যে-সব কথা এখন ব'লে চ'লেছি, সে-সব অনেক দিনের হ'লেও স্মৃতি-রাজ্যের বাইরে চ'লে যায়নি। মনে করলেই সকল কথা মনে আসে। অথবা মনে করলেই আমি কথাগুলোকে আবার মনে করতে পারি। কথাগুলো এতই স্পষ্ট ছিল—আমার অন্তরজগতে এই সব কথা এমন ভাবে মুদ্রিত হয়ে গিয়েছিল যে, সমস্তই আমার চোখের সামনে যেন ভেসে ওঠে। কোনো কোনো সময়ে হয়তো কথাগুলোর নাগাল পাওয়া যায় না। কিন্তু আবার কোথা হ'তে সম্মুখে এসে পড়ে। যেন পাশেই ছিল, কাছে এল। হারিয়ে যায় নি কিছু।

মৌনীমার কথা আবার বলি। আমরা তখন চ'লে গিয়েছি ভীমতালে। যেমন নৈনিতাল, তেমন ভীমতাল। নৈনিতালেও এক বিরাট দীঘি আছে, ভীমতালেও তেমন রয়েছে এক সুন্দর জলাশয়। তাল শব্দটা সম্ভবত তলাও শব্দের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ ভীমতাল মানে ভীম নামক কোনো এক ব্যক্তির সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত একটি জলাশয়।

আমরা সেখানে গিয়ে উপস্থিত। প্রথমেই আমরা মনে রাখব, সমস্ত জায়গাটাই পাহাড়ী জায়গা। অঞ্চলটাই যে পাহাড়ী অঞ্চল। ভীমতাল হিমালয়েরই অন্তর্গত একটি অঞ্চল। সেখানে ডাক্তার পন্থের সুন্দর বাড়ি। একটি জলাশয়ের একপাশে বাড়িটি অবস্থিত।

চারিদিকে পাহাড়, পাহাড় আর পাহাড়। সেই পাহাড়ের মধ্যেই কোনো একটা উপত্যকায় এই ভীমতাল অবস্থিত। এই-রকম মনে পড়ে।

ডাঃ পন্থের বাড়িতে আমরা সকলেই আছি। মৌনীমাও আমাদের সঙ্গে আছেন। আমার মনে পড়ে, একখানি ছোটো নৌকোতে আমরা মধ্যে মধ্যে বেড়াতে বাহির হ'তাম। কলিকাতা অথবা নিকটবর্তী কোনো অঞ্চল দেখলে ওই সকল স্থানের কথা ধারণায় আনতে পারা যাবে না। এইরকম সব স্থানে রকমটাই আলাদা। সর্বদাই ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব। সে রকম মারাত্মক শীত নয় অবশ্য।

নৌকোতে আমরা বাহির হয়েছি কয়েকজন। আমি আছি, মৌনীমা আছেন, লীনা ব'লে মেয়েটি—সেও আছে। লীনা কে? আমাদের গুরুপ্রিয়া দিদির খুড়তুতো ভাই জে. সি. মুখার্জী মহাশয়ের কন্যা।

নৌকোতে নানা রকম গল্প চলেছে। লীনা ইংরাজী স্কুলে শিক্ষিতা। যতদূর মনে পড়ে সে তখন এলাহাবাদ থেকে বি. এ. পাশ করেছে। আমি তো একাডেমিক্যাল লেখাপড়াতে একেবারে ঠন্‌ঠন্‌। অনেকের অনেক পিছনে প'ড়ে আছি। আমার বিস্তর বাইরের বই পড়া ছিল। সে হিসেবে জানাশুনো আমার কম ছিল না। বি. এ. নই, এম. এ. নই, এমনকি আই এ. পাশও নই। আমার তো এই অবস্থা। কলিকাতার স্কটিশচার্চ কলেজে পড়তে পড়তে সেই যে আমি ভাগলবা হয়েছিলাম—ইস্কুল কলেজের বিদ্যা সেইখানে এসে থেমে গিয়েছিল। আর এগোয় না। কিছুতেই আর এগোয় না। ব্যাস্‌ ওই পর্যন্ত।

পরিচ্ছেদ—২৬

তারপরে আমার পিতৃদেবের ইচ্ছানুসারে আমি জানকী পণ্ডিত-মশাই-এর টোলে অথবা চতুষ্পাঠীতে ভর্তি হয়ে সামান্য কিছু সংস্কৃত চর্চা করেছিলাম।

বাইরের হিসেবে যেমনই হোক, আমার সংস্কৃত অভ্যাসকালে এমন এমন কিছু ঘটনা ঘটতে লাগল, যা আমার পক্ষে বিশেষ অর্থবহ। প্রথম কথা, রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের সঙ্গে যোগাযোগ। দ্বিতীয় কথা, আমার পণ্ডিতমশাই শ্রীজানকীনাথ সাহিত্যশাস্ত্রী মহোদয়ের সঙ্গলাভ। তাঁর ভ্রাতা ছিলেন পণ্ডিত দ্বারিকানাথ শাস্ত্রী। লোকে বলত দ্বারিক শাস্ত্রী — তিনি সেকালের একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত ব্যক্তি। এখানে সেই কথাই মনে পড়ছে। আমাদের বৈদিক ব্রাহ্মণ সমাজে সকলেই ছিলেন প্রায় এক ধরনের মানুষ যাঁরা গরীব এবং পণ্ডিত। তাঁদের মধ্যে অনেকে যেমন গরীব তেমন পণ্ডিত। আমার পরিচিত আমাদের আত্মীয় বন্ধু প্রায় সকলেই ওই রকমের, ইংরাজী তাঁরা জানতেন না এ রকম নয়। তাঁদের মধ্যে অনেকে অথবা কিছু কিছু ইংরাজী ভাষায় ছিলেন কুশলী। তবু তাঁদের মধ্যে প্রায় সকলেরই ওই এক দশা। খুঁজলে অনেক বিদ্বান ও পণ্ডিত পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু আর্থিক অবস্থা প্রায় সকলকারই এক রকম, অর্থাৎ কিছুই নয়। কারও কারও কাছে এই রকম কথার আভাস পেতাম, বৈদিক ব্রাহ্মণ মানেই এই। বৈদিক ব্রাহ্মণদের মধ্যে তেমন ধনী ব্যক্তি একজন আধজন ছিলেন হয়তো। তাঁদের সংখ্যা আঙুলে গোনা যায়।

এই কথাতে আর এক কথা মনে আসে। সমস্ত পৃথিবীর আন্তর্জাতিক আর্থিক অবস্থা কোন্ সে কাঠামোর উপর দাঁড়িয়ে আছে, সেই কথাটাই আমি এখন চিন্তা করি। চিন্তা অবশ্য খুব কমই করি। তবু কখনও কখনও মনে আসে না তা নয়।

আমার চিন্তা এইরকম ধারায় চলতে থাকে। সমস্ত জগতের প্রত্যেকটা বিষয়ে একের সঙ্গে অপরের সম্বন্ধ সর্বদাই সক্রিয়। এক ছেড়ে অপর চলে না। প্রত্যেকটা বিষয়ের সঙ্গে প্রত্যেকটা বিষয়ের কিছু-না-কিছু সম্পর্ক আছে। অনেকটা ঘড়ির মধ্যেকার চাকার মত। এক চাকার সঙ্গে আর একটা চাকার সম্বন্ধ। সব মিলিয়ে একটি সমগ্রতা।

আমি দেখতে পাচ্ছি— আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, এই সংসার

একটি মাত্র বিরাট সংসার। সংসার দুটি নেই। একটি। সেই একটি-মাত্র সংসারে কত বিভিন্ন জনের কত কাজ, কত মনোভাব। বৈচিত্র্য আছে, কিন্তু একের অন্তর্গত বৈচিত্র্য। সকল নিয়ে একটি সংসার। সকল ঘটাতে একটি মাত্র ঘটনা।

এইরকম বড় তালে তাল মিলিয়ে যদি নৃত্য অভ্যাস করা যায়, তবেই সেই নাচ হয়ে উঠবে জীবন-নৃত্য। যেমন জীবন-সঙ্গীত তেমনই জীবন নৃত্য।

জীবনটার গানের সঙ্গে তুলনা হয়, আর নাচের সঙ্গে হয় না? গানের সঙ্গেও হয় আবার নাচের সঙ্গেও হয়। গানে গানে জীবন ঝংকৃত। নাচে নাচে জীবন তেমন স্পন্দিত। আবার সৌন্দর্যে এবং আনন্দে জীবন অলংকৃত।

জীবন যেমন গানের, তেমনই নাচের। যেমন সুরের তেমনই ছন্দের। জীবন এক অপরূপ বস্তু। সমস্ত জীবনটাই যেন একটা স্পন্দন। নিরন্তর এই স্পন্দন। আপনাতে আপনি স্পন্দিত হচ্ছে। আমাদের শাস্ত্রে 'স্পন্দ' ব'লে একটি শব্দ আছে। স্পন্দন নয় স্পন্দ। আমার আচার্য মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজজীর মুখে এই শব্দটির বহুল ব্যবহার পেয়েছি। তা ছাড়া প্রাচীন তন্ত্রশাস্ত্রের কয়েকখানি গ্রন্থ কিনেছিলুম। তাতে দেখেছি স্পন্দ শব্দের ব্যবহার।

আমি যা বুঝেছি বলছি। এই জগৎ একটা নিরেট বস্তু নয়। শান্ত অথবা স্তব্ধ কোনোরকম ভাব এর মধ্যে নেই, বরং আছে চিরচঞ্চল, চিরদোদুল্যমান একটি অবস্থা। দেওয়ালের মত নয়, আমাদের চিরপরিচিত আকাশের মতও নয়। দেওয়াল অথবা আকাশ, পাথর অথবা কোনও স্থাণু বস্তু এসব এখানে কোনো তুলনাতে আসে না, এরকম কোনো বস্তুর কথা মনে পড়েই না। মনে পড়ে বরং সমুদ্রের কথা। আমরা এখানে যে সমুদ্রের কথা বলছি সেই সমুদ্র অনাদি এবং অনন্ত। অপার এবং অসীম।

সেই বস্তুটিকে যে দেখেছে সে সকল সীমা পেরিয়ে পৌঁছে গেছে এক আজব ক্ষেত্রে। পার নেই, কূল নেই—হিসেব নেই, নিকেশ নেই—কিছুই

নেই। সব কিছুই আছে সেখানে তাই তার কিছুই নেই। এইখানে এসে ঠেকতেই হবে। এইখানে এসে ঠেকলে সকল শেষ হয়ে যাবে তা নয় কিন্তু। বরং সকল কিছু পাওয়া যাবে। যেখানে সব কিছু আছে—এমন কি কিছু যে নেই সেইটেও দাঁড়িয়ে রয়েছে সেইখানকার কথাই আমি বলছি।

কথা বলতে গেলে সেইখানকার কথাই বলতে হয়। আর কি কথা বলব। অন্য সব কথা পরিণামে আবোল তাবোলের রূপ নেয়। আমার অন্য কথা মনে তেমন ধরেই না। আমার মনে ধরে সেই যে অধরা সেই যাকে ধরা যায় না—যাকে একেবারে ধরাই যায় না সেই বস্তু আমার মনের কাছে কিন্তু মনের মতন হয়ে ধরা দেয়।

পাওয়া যাকে যাবে না তাকেই পাওয়ার জন্যে আমার প্রাণ ব্যাকুল। এ কি কাণ্ড! পাওয়া যাবে না, তবু তাকে পেতে চান? হ্যাঁ, তাই আমি পেতে চাই। পাওয়া তাকে যাবে না সেইজন্যেই তো তাকে আমি পেতে চাই। পাওয়া যাবেনা ব'লেই তো আমার লোভ।

গীতাতে তিনটি শব্দ আছে—কাম, ক্রোধ এবং লোভ। এই তিনটি শব্দকে নিয়ে অনেক কথা উঠেছে। এই তিনটি বস্তু নাকি নরকের দরজা। এই তিনটি জিনিস নাকি আত্মাকে বিনাশ করে। বিনাশ করে শব্দের অর্থ কি? বিনাশ করে শব্দের অর্থ একেবারে ঢেকে দেয়, আবৃত করে।

আসল কথা কি, যেটা যা নয় সেটাকে তাই ক'রে দেখায়। যেটা যেমন সেটাকে দেখায় অন্য রকম ক'রে। এই রকম।

ধরনটা এই রকম। শুধু ধরনটা কেন জগৎখানাই এইরকম। এই জন্যেই তো জগৎ বলে। নিয়ত বদলায় তাই জগৎ। চ'লে চ'লে যায় তাই জগৎ। এই এরকম ওই ওরকম। ভোলা তার ভোল্ পালটাচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে। ধরবার জো নেই। কে বুঝবে, কে জানবে, কে ধরবে।

আমার মায়ের নাচ চলেছে। আমার মা সে। আমার কন্যা সে। সে নেচে নেচে চলেছে। তার নৃত্যের তালে তালে জগৎটাই দুলছে। ছোট্ট মেয়ের নাচ। যে মেয়েকে কুমারী পূজো করা হয় সেই মেয়ে আজ

নাচে মেতেছে। কুমারী মেয়ে নৃত্যশীলা। 'কু' কে মেরেছে তাই সে কুমারী। আমি ভাল ক'রেই জানি সে কুমারীও বটে সুমারীও বটে। 'সু' কে না মেরে কেবলমাত্র 'কু' কে মারলে তো চলবে না। চরম পথে যাওয়ার পথে পরম বস্তুকে পাওয়াই লক্ষ্য আমার। আমার অথবা তোমার অথবা কারও 'সু' এবং 'কু' দুটোর পারেই যেতে হবে। 'কু' টা যেমন বাধা, 'সু' টাও তেমন বাধা। 'কু' এবং 'সু' এই দুয়ের পরপারে প্রকৃত বস্তু রয়েছে। সেইখানেতেই যাওয়া চাই।

ফট্ ক'রে একটা কথা মনে প'ড়ে গেল। ছেলেবেলায় একটা কবিতা পড়েছিলাম, মুসলমান কবির লেখা। আন্‌মনে একা একা পথ চলিতে/ হেরিলাম ছোটো মেয়ে ছোটো গলিতে। ছোটো একটা গলিতে ছোটো একটা মেয়ে আপন মনে পথ চলেছে। আমিও পথ চলেছি, সেও পথ চলেছে। বেণী তার ফণিনীর মত পিঠের ওপর দুলছে।

কি আশ্চর্য কথা। এই কবিতাটির অংশ মনে হ'লেই আমার চোখের সামনে একটা ছবি ভেসে ওঠে। সরু একটা গলি। সেই গলিতে ছোটো একটা মেয়ে আপন চঞ্চলতায় আনন্দিত। অথবা সে যেন নাচতে নাচতে চলেছে। জগতের মূলে এই নাচ। তুমি দেখতে পাচ্ছ কিনা জানি না। আমি কিন্তু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি—এই বিশ্ব জগতের মূলে একটি মেয়ের অবিরাম নৃত্য।

কার সে নৃত্য আমি জানিনা। সে কালীর নৃত্য না দুর্গার নৃত্য অথবা আর কোনো দেবীর নৃত্য। আমি কিছুই জানি না। আমি জানতে চাইও না। আমি শুধু জেনে ব'সে আছি—মেয়ে একজন নাচছে, তার পদভরে ধরা কিন্তু টল্‌মল্ করছে না। আলতো পায়ের আলতো নাচ।

কখনও টল্‌মল্ করে না তা কিন্তু বলছি না। কখনও কখনও পদভরে ধরা কাঁপে। কাঁপুক গিয়ে। তাতে আমার কিছু যায় আসে না। আমি সেই ছোট্ট মেয়েটির আলতো পায়ের আলতো নাচ দেখতে পেয়েছি। তাতেই আমার মন ভরেছে।

কখনও সেই মেয়ে শিবের আকার নেয়। তখন সে শিব পরম এবং চরম, বৃহৎ এবং মহৎ।

সেই শিব আবার নাচে দেখতে পাই। সকল সময়ে চোখে পড়ে না। কিন্তু কখনও কখনও কারও কারও চোখে পড়ে। তখনকার মত নটরাজ মূর্তি। তারই পদভরে ধরা কাঁপে।

শিবের নাচ চলেছে। ছন্দের জগতে এসেছে জোয়ার। দুনিয়া টালমাটাল। কিন্তু আমি যে-কথা বলছিলাম সেইখানে আলতো পায়ের আলতো নাচ। নাচ কার? নাচ সেই একজনেরই।

পরিচ্ছেদ—২৭

এবার আর এক গল্পে চলে আসি। আমার জীবনী-সাহিত্যের মধ্যে আর এক কাহিনী। অতি পুরাতন কাহিনী।

গুলু ওস্তাগর লেনের বাড়ীতে থেকেছি আমরা অনেক কাল। আমার ছেলেবেলা প্রায় সেখান থেকেই আরম্ভ। তার পূর্বের কথা নিতান্ত শিশুকালের কথা।

গুলু ওস্তাগর লেনে পি. এম. বাগচীর কারখানার খুব কাছে প্রায় বিপরীত দিকে ছিল আমাদের ১১ নম্বরের বাড়ীটি। বাড়ীওয়ালা ছিলেন মুসলমান। বিরাট তার চেহারা। দশাসই, লাগসই অথবা বলতে পার সুপুরুষ। তখন ওই অঞ্চলে অনেক সব মুসলমান থাকতেন। আমাদের বাড়ীর খুব কাছে—এক মিনিটেরও পথ নয় থাকতেন সাতকড়িবাবু। তিনিও মুসলমান। তাঁর ছিল দুই ছেলে। মান্না আর শ্যামা। দেখছেন তো কেমন সব নাম। মুসলমানের হিন্দু ছাঁদের নাম। সাতকড়িবাবুর বাড়ীতে সাতকড়িবাবুর বৃদ্ধ পিতা রোয়াকের উপর চুপ ক'রে ব'সে থাকতেন

অনেকক্ষণ ধ'রে। একটা কথা এখানে ব'লে রাখি, তখনকার দিনে দেখেছি অনেক বাড়ীতেই বাইরের দিকে রাস্তার ধারে লম্বা এক খণ্ড রোয়াক থাকত। এক খণ্ড বড়, এক খণ্ড ছোট। দরজার এপাশে আর ওপাশে। সেই রোয়াকের উপর ব'সে থাকতেন সাতকড়িবাবুর অতি বৃদ্ধ পিতা। ঠায় ব'সে থাকতেন।

সাতকড়িবাবুরা ছিলেন মোটামুটিভাবে বেশ ভদ্রলোক। তবে একটি কাণ্ড ঘটত। সাতকড়িবাবু মাঝে মাঝেই মদ্যপান করতেন। কোনো কোনো দিন এমন হ'ত রাত্রিকালে মদ্যপান ক'রে আমাদের বাড়ীর দরজার কাছে এসে আমার বাবার নাম ধ'রে চীৎকার করতেন এবং গালাগালি করতেন। আবার তার পরের দিনই সকাল বেলায় এসে নিতান্ত দীন ভাবে বাবার কাছে ক্ষমা চাইতেন।

যে কথা বলব ভেবেছিলাম সেই কথা বলি। আমাদের বাড়ীর থেকে কয়েক রকমের কবচ দেওয়া হ'ত অর্থের বিনিময়ে। নবগ্রহ কবচ, শান্তি কবচ ইত্যাদি। এই সব কবচ বাজারে খুব চলত। কবচ সম্বন্ধে আমার মতামত আমি পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছি। এই পুস্তকের কোথাও না কোথাও। রত্নধারণ সম্বন্ধেও সেই কথা। এখানে বক্তব্য এই, একদিন আমাদের কাছে কবচ কিনতে এলেন জোড়াসাঁকোর ঠাকুর family র এক ব্যক্তি। রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কিত কোনো একজন। যতদূর মনে পড়ে সেই ব্যক্তি কবচের সন্ধানে এসেছিলেন গোপনে। প্রচলিত হিন্দু পথের এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কাছ থেকে কবচ ক্রয় ক'রে ধারণ করা খোলাখুলি অনেকের পক্ষে হয়তো সম্ভব ছিল না। কারণ তাঁরা ছিলেন ব্রাহ্ম।

আমার কথা আমি বলি। একবার গিয়েছিলুম রাঁচীতে। আমাদের বাড়ীর সবাই প্রায়। বাড়ীতে কাজ করত খুদু—সে অবধি। পিসতুতো বোন—যাকে বলতাম দিদি, তার স্বামী সুধীর চক্রবর্তী তারাও। আমার ঠাকুরমাও গিয়েছিলেন।

রাঁচীতে থাকাকালে আমি নবগ্রহ কবচ একটি ধারণ করেছিলাম

কেন জানিনা। আমার বয়স তখন নিতান্ত অল্প। কবচ পরেছিলাম এবং কবচের নিয়ম পালন করতাম। হয়তো বা শরীরের জন্যই হবে। আমার শরীর তখন এমন কিছু খারাপ না, তবে একটু আধটু খারাপ বটে।

রাঁচীতে আমরা খুব বেড়াতাম। বাবা আমাকে সাইকেলের সামনে বসিয়ে বিরাট মাঠেব এলাকাতে এক আধটা চক্কব দিতেন। এই রকম আমার বেশ পরিষ্কার মনে পড়ে।

পাহাড়ের দিকে একটা বাড়ী ছিল। লোকে বলত Tagore Castle অর্থাৎ কিনা জোড়াসাঁকোর ঠাকুর family র একটি প্রাসাদ ধরনের অট্টালিকা।

রাঁচীতে মনে পড়ে একটি হাটের কথা। হাটবারে হাট বসত। অগুণতি লোক সেই হাটে কেনাবেচা করত। আমাদের বাড়ী থেকে খুদুও সেই হাটে যেত। একদিন খুদু ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেল। খোঁজাখুঁজি খোঁজাখুঁজি। আমাদের বাড়ীতে কে একজন কুলুঙ্গির ভিতরে পর্যন্ত খুদুকে খুঁজেছে। এই নিয়ে হাসাহাসি।

আর একটি কাহিনী। আমি তখন ছেলেমানুষ। বয়স সাত আট। ছেলেমানুষ হ'লেও বুঝতে পারতুম অনেক কথা।

আমার ঠাকুমাকে কে যেন পরামর্শ দিয়েছে পেঁয়াজের কলি খেতে বেশ ভাল। খেলে দোষ কি। খাওনা তোমরা। মনে রাখতে হবে ঠাকুমা তখন সধবা। আর মনে রাখতে হবে সধবার পক্ষে অনেক কিছু চলে, বিধবার পক্ষে চলে না। ঠাকুমা করেছেন কি একদিন ঔৎসুক্যবশত পেঁয়াজের কলি যোগাড় ক'রে চচ্চড়ি মতন কি রান্না করলেন। হঠাৎ বাবা এসে জিজ্ঞেস করলেন, এগুলো কি? ঠাকুমা তাঁর ছেলের কাছে থতমত খেয়ে কি যেন কি জবাব দিলেন। বাবাকে একটা কিছু বুঝিয়ে দিলেন। বাবা কিছু বললেন না। তাঁর নিজের কাজে চ'লে গেলেন। পেঁয়াজের কলি খাবার জন্য এই ছলনাটুকু আমি কিন্তু দূরে দাঁড়িয়ে বেশ বুঝতে পারলুম। অনেক কথাই ভুলে গেছি, কিন্তু এ কথাটা মনে আছে। এখন

ভাবি, এ আর কি। ঘটনা কিছুই নয়। পেঁয়াজের কলি খেলেই বা কি আর না খেলেই বা কি। আমি অবশ্য পেঁয়াজ এবং রসুন খাই না কোনোদিন। ক্বচিৎ কখনও বহু বৎসর আগে মুড়িটুড়ির সঙ্গে মাঠে ময়দানে বেঞ্চির উপরে পেঁয়াজ খেয়েছি। রসুনও হয়তো কখনও খেয়েছি। রসুন খেয়েছি আরও কম। এই তো ইতিহাস। এখন ভাবি এতে আছে কি। কিছুই নেই। পেঁয়াজ এবং রসুন আমরা খাই না। গন্ধের তীব্রতার জন্য। ছেলেবেলা থেকে না খেয়ে খেয়ে না খাওয়াটাই অভ্যেস হয়ে গেছে, মনে হয়, না খাওয়াটাই ভাল। কিন্তু খেলে পরে মহাভারত তেমন কিছু অশুদ্ধ হয়ে যায় না।

আনন্দময়ী মার কাছে পরবর্তীকালে অনেকদিন ছিলুম সে তো সবাই জানে। মা যখন মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করেছিলেন মহাত্মা গান্ধী মাকে টেনে নিয়েছিলেন একেবারে বুকের মধ্যে আমাদের সবাইকার সামনে। পরে মা বলেছেন, পিতাজীর মুখে ভীষণ পেঁয়াজের গন্ধ। পেঁয়াজের অথবা রসুনের। আমার কথা এই, এসব নিয়ে তুলকালাম কিছু করবার প্রয়োজনই নেই। ধুন্ধুমার কিছু ব্যাপারই নয়। সেরকম কাণ্ডই নয়। বরঞ্চ মিথ্যে কথা বলা, চুরি করা, মানুষকে ঠকানো—এ সব ব্যাপার কিছু কাণ্ড বটে। বাড়তে বাড়তে এইগুলোই পরে বিরাট বিশাল আকার নেয়। আবার চরিত্রের দিকটাও নজর রাখতে হবে। নজর রাখতে হবে এই জন্য যে, ওতে ক'রে আমার পক্ষে, তোমার পক্ষে, সকলের পক্ষেই বড় রকমের গোলমালের সম্ভাবনা আছে। ব্যাপারটা গড়িয়ে অনেকদূর চ'লে যায়। সেই জন্যই নজর রাখতে বলি।

এক এক সময় এক এক কথা মনে আসে। খাতায় Point গুলো টুকে রাখতে বলি। এইখানে গোপীনাথ কবিরাজ সম্পর্কে একটি কথা মনে পড়ল। কাশীতে রেউরীতলায় বাচ্চুর মার বাড়ীতে তখন আমরা আছি। সেই বাড়িতে অনেকগুলো ঘর। আমরা আছি মায়ের সঙ্গে সম্ভবত। সম্ভবত কেন বললুম অনেক সময় মা আমাকে বা তেমন কাউকে

কোনো এক স্থানে রেখে দিতেন দু চার দিনের জন্য। কোনো বিশেষ অবস্থায় বিশেষ কারণে।

কিন্তু রেউরীতলার সেই বাড়ীতে গোপীনাথ কবিরাজ যে এসেছিলেন তার অর্থই এই, আনন্দময়ী মা নিশ্চয়ই ছিলেন সেখানে। মা না থাকলে গোপীনাথ কবিরাজের মত লোকের সেখানে আসা সম্ভব নয়। আমার মনে আছে আমি গোপীনাথজীকে নিয়ে এলাম আমার ঘরে দোতলার উপর। উদ্দেশ্য আমার লেখা কিছু শোনানো। আমি শোনালাম, না তিনি খাতা দেখলেন সে কথা মনে পড়ছে না। তবে মনে পড়ে, লিখেছিলাম 'জগদাতীত' কথাটা। তিনি বললেন, জগদাতীত শব্দ হয় না। হবে জগদতীত।

সম্ভবত সেই বাড়ীতে মা ছিলেন দু বার কি তিন বার। আমি আমার হাঁপানি নিযে অথবা বুকের অসুখ নিয়ে বিশেষ কাহিল অবস্থায় একবার যে ওখানে ছিলাম এবং মা সে সময় ছিলেন না সে কথা আমার বেশ মনে আছে।

হাঁপানী রোগটা আমার কাছে এসেছিল বছর তিনেকের মত। কত কষ্ট, কত চিকিৎসা। কাশীতে গঙ্গার ওপারে পূর্ণিমা তিথিতে পায়েস না কি রেঁধে খাওয়া এই রোগটার উপলক্ষ্যেই। মনে পড়ে কিছুতেই কিছু হ'ল না। কলকাতাতে ডাক্তার জ্ঞান মজুমদারকেও দেখিয়েছিলাম। তিনি ছিলেন বিখ্যাত হোমিওপ্যাথ। তাই কথাটা উল্লেখ করলাম। কোনো ফল আমি বুঝতে পারিনি। তারপরে যখন রোগটি গেল তখন আপনিই চ'লে গেল।

আর একটা রোগের কথা বলছি। সেই রোগটা আমার কাছে এসেছিল বেশ কয়েক বছরের জন্য। তার জন্যও না করেছি বোধহয় হেন কাজ নেই। পাকস্থলীর কাছাকাছি একটা জায়গায় কি রকম একটা কষ্ট। আবার দেখতাম সেই জায়গায় বাইরের থেকে ছুঁলেও একটা যন্ত্রণা উপস্থিত হ'ত। ভিতরে কষ্ট বাইরে কষ্ট। অনেক সময় খেলে পরে ব্যথার উপশম ঘটত। না খেলেই বেশী কষ্ট। এই অসুখটা নিয়ে অনেকদিন ভোগ

করলুম। তারপরে যখন ক'মে যাবার আপনিই ক'মে গেল। এখনও একটু আধটু হয়তো আছে। কিন্তু তেমন কিছুই নেই।

এইভাবে মানুষের ব্যাধি আসে। এবং ভোগকাল শেষ হয়ে গেলেই কোথায় যেন মিলিয়ে যায়। ব্যাধি কেন আসে তাও বলতে পারি না, ব্যাধি কেন চ'লে যায় সেই কথাও আমার জানা নেই। অনেক সময় মনে হয় এই কারণে এই হয়েছে। এই কারণে এই হয় বটে, কিন্তু সেই কথাই সব কথা নয়।

পরিচ্ছেদ—২৮

কত দিক দিয়ে কত কথা আছে। সে সব কথার খবর কে রাখে? যেমন আছে মহৎ ও মহীয়ান। তেমন আছে অণোরণীয়ান। বড়র থেকে বড়, ছোটোর থেকে ছোটো। আবার সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম। বড়ও না, ছোটও না। সূক্ষ্ম। তাঁকে আমরা বাইরের হিসেবের মধ্যে আনব কি ক'রে। আরও কত কি যে আছে ভাষায় বোধ হয় ব্যক্ত করতে পারব না। এইখানে dimension এর প্রশ্ন এসে গেল।

Dimension এক বিচিত্র হিসাব। আগেও এই কথা তুলেছি। ঘরের সিলিংএ টিকটিকিগুলো অনেক সময় ভারী দেহ নিয়ে—বড় টিকটিকিও তো আছে, স্বচ্ছন্দে চলাফেরা ক'রে বেড়ায়। পড়েও না। আবার দেখি—কলকাতায় নয়, শান্তিনিকেতন প্রভৃতি অঞ্চলে টিকটিকির বড় দাদা পাঁচিলে ঘুরে বেড়ায়। তাকে বলি গিরগিটি। এই ছিল লাল, একটু পরেই সবুজ। খানিক বাদেই আবার অন্য রং। রং বদলাবার কায়দাটা কিছুতেই বুঝতে পারছি না। কোনটাই বা বুঝি। কিছুই যে বুঝি না এইটেই ভাল কথা। আমার তো মনে হয় এই কথাটা দারুণ কথা এবং

পাকা কথা।

হিসেব আমার সব জায়গাতে মেলে না। হিসেব আমারও মেলে না, তোমারও মেলে না। কারোর হিসেবই মেলে না। সব জায়গাতেই গরমিল। এইটির নাম দুনিয়া। ঠিক এই কথাটিকেই ভাল ক'রে বুঝে নিতে হবে। আমি যে বুঝতে পারি না, এই কথাটিকে যেন বুঝতে পারি। এত বড় বড় ডাক্তার—কত তার টাইটেল। কিন্তু কার কখন রোগ কেন হবে সে কথাটা বুঝতে পারে না কেন? দুধটা দই হয়ে যায়, দই হয়ে যাবে এই কথাটা যেমন বুঝতে পারা যায়, তেমন আমরা বুঝতে পারি না কেন অমুক দেহে অমুক রোগটা আসছে? রোগ আসবে তার আভাস নিশ্চয় এসে গেছে। তবে আমরা বুঝতে পারি না কেন? ডাক্তারি বিদ্যা সেইখানে এখনও যায়নি কি?

ভবিষ্যৎ-বলা ব'লে একটি জিনিস অনেক সময় বিজ্ঞাপনে, সাইনবোর্ডে দেখতে পাই। সেটা কি সত্য।

তার উত্তর, আমার কাছে অনাদি অনন্ত বিশাল বিশ্বে ভবিষ্যৎ-কথন একটি আশ্চর্য বস্তু। ভবিষ্যৎও আছে। ভবিষ্যৎ কখনও কোথাও না কোথাও রয়েছে। সেই বিরাট আশ্চর্য ভবিষ্যৎ—সেটাও একটা আশ্চর্য অদ্ভুত অলৌকিক বস্তুর মত নিশ্চয় রয়েছে। খণ্ড ভবিষ্যৎ এবং পূর্ণ ভবিষ্যৎ। পূর্ণ ভবিষ্যৎ অন্তহীন।

আমার এক বন্ধু ছিল, দেবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। বন্দ্যোপাধ্যায়টা কবে যে ব্যানার্জী হয়ে গেল সেই কথাটাও আমার কাছে বিচিত্র লাগে। শুধু তা কেন, চট্টোপাধ্যায় হয়ে গেল চ্যাটার্জী। ছিল মুখোপাধ্যায় হয়ে গেল মুখার্জী। কোথাও কিছু নেই তিনটে 'জী' এসে জুটেছেন। তারপরে দেখছি—দেখছি কেন, চিরকাল দেখেছি গঙ্গোপাধ্যায় তিনি হয়ে দাঁড়িয়েছেন গাঙ্গুলী। এই রকম সব ইংরেজীয়ানার বিচিত্র বাহার।

যাক্ বেদদাস—আমার ছোটো ভাইএর মত—একদিন আমাকে বললে: অভয়দা আমার একজন আত্মীয় আছেন, তাঁর হয়েছে ক্যানসার

মুখের ভিতরে। একটা দিকের মাড়ি একেবারে ফুলে অস্থির কাণ্ড। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার তাঁর কোনো খেদ নেই মনের মধ্যে। তিনি বলেন, সমস্তই মায়ের ইচ্ছে। মা যেমন করেছেন তেমনই ভাল। আপনি যাবেন তাঁকে দেখতে? এরকম লোককে তো আমি দেখতেই চাই। তক্ষুণি বললাম, নিশ্চয় যাব। নিয়ে গেল আমাকে বাড়ীতে। লোকটির সঙ্গে দেখা হ'ল। ক্যানসারে মুখের একটা দিক মস্ত বড় ফুলে উঠেছে। কিন্তু কথা কইতে পারছে। আমাকে বললে, আমার কোনো আক্ষেপ নেই। সমস্তটাই মায়ের ইচ্ছে। রোগীর কথা শুনতে পেলুম, তার নাকি রয়েছে স্ত্রী, পুত্র ইত্যাদি। যাকে বলে ভরা সংসার। সে কিন্তু নির্বিকার। মা যা করেন। মায়ের উপরে এই নির্ভরতা দেখে সত্যিই আমি অবাক মানলুম। আমার মনে হয়, অনেক বড় বড় সাধক এর কাছে হার মেনে যায়। আশ্চর্য মানুষ বটে। কষ্ট তো আছেই। সম্মুখে সাংঘাতিক ভবিষ্যৎ। তবু, কিছুই গায়ে মাখছে না। ঋষি বলতে আর কেউ আছে কি? এ রকম মহৎ ব্যক্তিকে আমি প্রণাম না জানিয়ে পারছি না।

পরিচ্ছেদ—২৯

আচার্য বিজয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় আমার জীবনের মধ্যে একজন অতি উজ্জ্বল মহাপুরুষ। স্বচ্ছন্দে তাঁকে মহাপুরুষ বলতে পারি। হাওড়ার কালী কুণ্ডু লেনে তিনি থাকতেন। তাঁরই সন্তান অথবা শিষ্য শ্রীশ্রীসত্যদেব ঠাকুর—তিনি রচনা করেছেন সাধন সমর নামক গ্রন্থ—শ্রীশ্রীচণ্ডীর ব্যাখ্যা। গুরু করেছেন অপরূপ গীতার ব্যাখ্যা। অতি আশ্চর্য অতি সুন্দর—বিস্তারিত। এরকম বই দেখা যায় না। কত সব বই ছাপা হচ্ছে, প্রচারিত হচ্ছে। এই বই তেমন প্রচারিত হয় না কেন? আমার মনের

এই এক কথা। বইখানি বিরাট। আমি পড়তুম যেন গিলতুম। গিলতুম বললেও ভুল করা হয়। রসিয়ে রসিয়ে পড়তুম বটে। বাসে ক'রে কোথাও যাচ্ছি—বাসের মধ্যেও সেই বই পড়ছি। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী নয় কিন্তু। আচার্য বিজয়কৃষ্ণ আমার মন প্রাণ যেন কেড়ে নিয়েছিল। তাঁরই দুই শিষ্যের সঙ্গে আমার প্রথম জীবনে দেখা হয়েছিল। একজন কালীকান্ত গৌতম। কলকাতার টাউন স্কুলে হেড পণ্ডিতমশাই ছিলেন তিনি। গুরুও যেমন, শিষ্যও তেমন। কালীকান্ত পণ্ডিতমশাই আমার ভাই-এর মুখে শুনেছিলেন আমার কথা। অমনি আমাকে ডেকে পাঠালেন। তিনি যে ঈশ্বরের কাছের লোক। ভগবানের অনুভবে তাঁর জীবনে প্রকাশ পেয়েছে ভাবের ঐশ্বর্য। যেই আমার ভাই এর মুখে শুনলেন, আমি ঈশ্বরের খোঁজে অথবা ঈশ্বরের প্রেমে অথবা ঈশ্বরের প্রসঙ্গে বেরিয়ে গিয়েছিলুম, অমনি আমাকে তিনি কাছে চাইলেন এবং কাছে ডাকলেন। আমি তখন নিতান্ত ছেলেমানুষ। গোঁফ-দাড়ি ভাল ক'রে ওঠেনি। আমি তখন বলতে গেলে এক পাগল। ঈশ্বর, ঈশ্বর ক'রে কে আর ওরকম ভাবে পথের বাহির হয়ে যায়। পাগল ছাড়া আর কি। শুনেছিলাম তাঁকে জীবনের সার ক'রে এগিয়ে যেতে না পারলে অথবা বেরিয়ে পড়তে না পারলে তাঁকে পাওয়া যাবে না। কত কথাই শুনেছিলাম। অথবা প'ড়েছিলাম। তাই তো আমি পনের ষোল বছর বয়সে হয়েছিলাম পথের বাউল। মনের ভাব এই ছিল, এই পরিবেষ্টনী থেকে ছিটকে বাইরে যাওয়া চাই। দু বার বাড়ীর থেকে পালিয়েছিলাম।

সেই যে ঘর ছাড়া হয়েছিলুম আর বোধহয় তেমন ক'রে ঘরে ফিরতে পারিনি। সংসারে প্রবেশ করেছি বটে, সংসারের মধ্যে দিনও আমার কিছু কিছু কেটেছে বটে, কিন্তু আমি এখন বুঝতে পারি, সংসারকে আর আপন ক'রে নিতে পারিনি। সেই যে বাইরে চ'লে গেলুম সেই থেকে বাইরেই রয়ে গেলুম। ঘুরতে ঘুরতে কখনও কখনও আছাড় খেয়েছি বটে, কিন্তু সেও বাইরেই আছাড়। ঘর আমাকে আর গ্রাস করতে পারেনি।

বাইরেও কত ঝড় কত ঝঞ্ঝা, কত অন্ধকার। কিন্তু তবু সেটা বাহির।

আমি তো বাইরেরই মানুষ। আমার জন্য বিশাল আকাশ, বিশাল ভুবন, বিশাল সমুদ্র। আমার জন্তে অনাদি এবং অনন্ত। অনাদি এবং অনন্ত যেন একটি অদ্ভুত মানুষ। মানুষ বলব, কি, কি বলব। আশ্চর্য এক চরিত্র। সে দু-হাত বাড়িয়ে আমাকে তার বুকের মধ্যে গ্রহণ করেছে। তারপর থেকে আমি আর কারোর নই। আমি সেই অনাদি এবং অনন্তের।

আমি বোধহয় আগের থেকেই সেই অনাদি এবং অনন্তের, অপরূপ এবং অদ্ভুতের—সেই আশ্চর্যের ডাক শুনতে পেয়েছি। ডাক শুনেছি তাই তো আমি অন্য রকম।

বহু বহু কাল। শুধু এই জন্মে নয়, অপরাপর জন্মেও ডাক শুনেছি, আমি ডাক শুনেছি। পাগল হয়েছি, আমি পাগল হয়েছি। এগিয়ে চলেছি, আমি এগিয়ে চলেছি।

সে যে আমায় ডাকছে। আমি তার দিকেই চলেছি। আমায় আটকাবে কে? আমাকে বেঁধে রাখবে কে? আমি ঘরের নই, আমি বাইরের। এও জানি, আমি ঘরেরও নই, বাইরেরও নই। যাঁর আমি তাঁর। তাই আমাকে রাখতে কেউ পারল না।

পরিচ্ছেদ — ৩০

সেই কথাটা মনে পড়ছে। বিবাহের কিছু পরে আমি এসেছি নবদ্বীপে। একজন ছিল আমার দিদি। তার নাম বুনিদি। মাতা আনন্দময়ীর অনেক সেবা করেছে। তারপরে সে কালের অতলতলায় তলিয়ে গেছে।

সেই বুনিদি নবদ্বীপে আমাকে বললে : জানিস অভয়, মা বলছিলেন

অর্থাৎ মা হাতের ইশারায় দেখিয়ে দিলেন, অভয়ের সন্তান হবে কতকগুলি। কলকাতায় যতীশ গুহ উকিল—তার মেয়ে এই বুনিদি। বুনিদির সঙ্গে আমার হ'ত অনেক কথা, অনেক গল্প গাছা। কিন্তু একটা কথা বারে বারে না ব'লে পারছি না, কোনোখানেই আমি কিন্তু নিজেকে হারিয়ে প্রায় ফেলতুম না।

আনন্দময়ী মায়ের কল্যাণে আমি কত শত জায়গায় চ'লে গেছি। বিচিত্র লোকের সমাবেশ আমার জীবনে। মায়েরই কল্যাণে কত রাজা রাজরা এসেছেন আমার জীবনে। কত state এর কত রাজা। কত বড় বড় নাম করা বিদ্বান মানুষ। আনন্দময়ী মায়ের নাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে তখন। মায়েরই টানে সবাই এসেছে। যেখানে যত নাম করা লোক সবাই মায়ের কাছে এসেছেন মনে হয়। জওহরলাল নেহেরু, বল্লভ ভাই প্যাটেল প্রভৃতি রাজনীতিবিদ তো এসেছেনই। ইন্দিরা গান্ধীও। তখন তিনি প্রধান মন্ত্রী হননি। মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গেও দেখা হয়েছিল মায়ের। সে একটি ইতিহাস। আমরা মায়ের সঙ্গে গিয়েছিলাম সেবা-গ্রামে। শুনেছি সুভাষবাবুও একবার মায়ের কাছে এসেছিলেন। সে এসেছিলেন দক্ষিণেশ্বরে। আমি দক্ষিণেশ্বরে চারদিকে বেড়াচ্ছি। পঞ্চবটির তলায় এসে শুনলাম, সুভাষবাবু এক্ষুণি এসে মায়ের সঙ্গে কথা ব'লে গেলেন।

একটা কথা। এত যে বড় বড় চাঁইরা মায়ের সঙ্গে দেখা ক'রে যেতেন এবং কথা ব'লে যেতেন মায়ের কিন্তু দৃক্‌পাত নেই। এ সব কথার উল্লেখ মায়ের মুখে খুব কমই শোনা গেছে। এইখানেই তো মায়ের বড়ত্ব। এইখানেই মা অসাধারণ। বড়লোক নিয়েও মার কারবার। আমার মত ছোটো ছোটো মানুষ নিয়েও মায়ের কারবার।

মা আনন্দময়ীর কথা ধরতে গেলে আমি তেমন ভাল ক'রে বুঝতেই পারি না। বুঝতে না পারলেও এইটুকু বুঝতে পারি, মায়ের অনেক কিছু থাকা সত্ত্বেও কিছু কিছু যেন অভাব ছিল বা কমতি ছিল। এ কথা আমার

বলার উদ্দেশ্য কি? আমার কি বলার অধিকার আছে? আমি কে, যে মায়ের কথা ওরকম ভাবে ধরব বা ওরকম ভাবে বলব? আমি তো কিছুই না। কিছু না হ'তে পারি, তবু আমার নিজের কাহিনী আমার বলবার অধিকার আছে বইকি। যার যার কথা সে বলবেই। আমার কথা আমি বলবই।

মায়ের সম্পর্কে অনেক দিন ছিলাম। মায়ের ঘনিষ্ঠতম আবেষ্টনীর মধ্যে কত-যে দীর্ঘ সময় কাটিয়েছি সে কথা তো সবাই জানে। মায়ের কথা আমি যদি না বলি, তবে অনেক কথা না-বলা থেকে যাবে যে।

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী ভারতের—এমনকি পৃথিবীর একটি উজ্জ্বল চরিত্র। তাঁর নাম ডাক ধর্মের দিক দিয়ে। খ্যাতিতে তিনি অনেককেই ছাপিয়ে গিযেছেন।

সত্যিই তিনি ছিলেন এক অদ্ভুত মানুষ। আমি ছিলাম তাঁর খুব কাছাকাছি। আমি তো তাঁর সন্তান। আমি ছিলাম মায়ের কোলের একেবারে কাছেই। মা ব'লেই তাঁকে ডাকতাম। মা মা মা ব'লে কত-যে গান গেয়েছি। এমনিতেই স্বাভাবিক ভাবে আমি মা বলতে ভালবাসি।

ছেলেবেলাতে—একেবারে শিশুকালে আমি মা বলতাম আমার ঠাকুরমাকে। সে অতি শৈশবে। তারপরে আর কাউকে মা বলতাম না। আমার নিজের মাকে ডাকতাম নাম ধ'রে। মায়ের নাম ছিল মন্তু। আমরা সব ডাকতাম মন্নো ব'লে। একটু বড় হওয়ার পর মাকে ডাকতাম মন্নো মা। এই রকমই চলছিল। শুধু মা বলা সেই সময়ে আমার ভাগ্যে হ'তই না।

এমন সময় আমার জীবনে এলেন আনন্দময়ী মা। তাঁকে মা ব'লে ডাকতে আমার প্রথম প্রথম কেমন যেন বাধতো। অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই আমি মা বলা অভ্যেস ক'রে নিলাম। তখন শ্রীআনন্দময়ী মা-ই আমার মা।

তারপরে এমন সময় এল, যখন গোটা বিশ্বটাই আমার কাছে মায়ের চেহারা পরিগ্রহ করল। এখানে কিন্তু আমার মা, তোমার মা নেই। এখানে রয়েছে শুধু একটি মা। মা না ব'লে অন্য কিছুও বলতে পারি। আমার কাছে শুধু মা না ব'লে বলতে পারি, শুধু একজন। এখানে একটু আটকাচ্ছে। জন কি না কে জানে। তবে জন বললেই অনেকটা সুবিধা হয়। জন বলাই বোধহয় সবচেয়ে ভাল।

মূল বস্তুটা কিন্তু ব্যক্তি নয়। গীতাতে কৃষ্ণ বলেছেন, বুদ্ধিহীন ব্যক্তিরাই অব্যক্ত আমাকে ব্যক্তিভাবাপন্ন মনে করে। মূলে তিনি ব্যক্তি নন। মূলের দিকে তিনি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রাহ্য নন। ইন্দ্রিয় তাঁকে ঠিকমত ক'রে পায় না। কোনো ইন্দ্রিয়ই পায় না। তিনি যে অব্যক্ত। ইন্দ্রিয়ের কাছে তিনি ধরা পড়েন না।

এ পর্যন্ত যা বলা হ'ল সেটা হিসেবের মধ্যের কথা। আর একটু কথা আছে। সেই কথাটুকু হিসেবের বাইরের কথা। সেই কথাটুকুই রসের কথা।

সত্যিকারের রস এমন একটি জিনিস যে সেখানে হিসেবপত্র কিছুই নেই। বাঁধা নিয়ম-কানুন সেখানে একেবারেই চলে না। আইন সেখানে খাটে না। গোনাগুনতি সেখানে চলে না। সে এক আজব দেশ।

সেখানে সবই অন্যরকম। সেখানে কি চলে আর কি চলে না, সেই কথাটাও ভাল ক'রে বলা চলে না। সেখানে রস কি না। সেখানে মজা কি না। সেখানে আনন্দ কি না। এই জগতের আনন্দটুকু সেখান থেকেই এসেছে। সেইখানেই প্রেম এবং ভালবাসা। সেইখানেই সব আছে অথচ কিছুই নেই। সেইখানেই যেমন চাও তেমন। সেইখানে কিছু না থাকলেও কিছুর অভাব নেই। নেই ভূমিটার কথাই এইখানে বলছি। সেইখানেতেই এক কথায় সব।

আমরা যেখানে থাকি সেইখানেতে একটি জন চাই। একটি মানুষ। একটি ব্যক্তি। সেই ব্যক্তি পুরুষও হ'তে পারেন, নারীও হ'তে পারেন। কিন্তু আমার চাই একটি ব্যক্তি অথবা বলতে পারি, আমার চাই একটি মানুষ। মানুষ ভিন্ন আমার চলবে না। এক হ'ক বা একাধিক হ'ক আমি মানুষকে চাই। একজন মানুষ অথবা দু-চার-পাঁচজন মানুষ হ'তে পারে। কিন্তু আমার মানুষ চাই-ই চাই। মানুষ ভিন্ন আমার চলবে না। হয়তো চাইছি মনের মত মানুষ অথবা মনের মানুষ।

এ সকল কথাই সত্য কথা। কিন্তু আমার মনের মাঝারে একটা বৈরাগ্যের সুর বেজে চলে যে। বৈরাগ্য আর বৈরাগ্য। আমার মনে কোন্‌খানে যেন একটি বাগান আছে। বৈরাগ্যের বাগান। বাগান কেন? বাগান এইজন্য যে, সেখানে গাছ আছে, ফুল আছে, ফল আছে। পত্র আছে, পল্লব আছে। ঘাস আছে, শৈবাল আছে। আমার সেই বাগানে এই সমস্তই আছে।

কিন্তু বৈরাগ্যের বাগান না ব'লে বৈরাগ্যের শ্মশান বললেই ভাল হয় মনে হচ্ছে। বাগানটাই বেশী সুন্দর, না শ্মশানটাই বেশী মনোহর সেই কথাটা এখন আমি বুঝতে পারছি না। বাগানটা ভাল লাগে, বাগানটা মনকে আকর্ষণ করে। কিন্তু শ্মশানটা আমাকে টেনে নিয়ে যায় কোন্ সে গভীরে। কোন্ সে আন্তরিকতার অতলতলাতে। মনটা চায় বাগান। কিন্তু প্রাণটা চায় শ্মশান। কার ডাকেতে সাড়া দেব। সংসারেতে মন, অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে প্রাণের স্পন্দন।

মন আর প্রাণ দুটো এক জায়গাতে ঠিকমত সহাবস্থান করে না। মন এক কথা বলে তো প্রাণ আর এক কথা বলে। মন হাসতে থাকে তো প্রাণ কাঁদতে থাকে। মন চাইতে থাকে চাই, চাই, চাই। প্রাণ বলে, আমার কিছু চাই না। কিছুমাত্র কিছুর দরকার আমার নেই। মন আর প্রাণের এইরকমের সম্পর্ক।

আসল কথা এই, মনই প্রাণ এবং প্রাণই মন। যেখানে মন সেইখানেই

প্রাণ। আবার প্রাণের কাছেই মন। দুটোই এক বস্তু বটে কিন্তু দুই রকমে প্রকাশ। দুটো ভঙ্গী। আর কিছুই নয়।

একটি শব্দের কত রকম অর্থ আছে। অর্থ তো আমরাই করেছি। আমরাই বিচিত্ররূপে একটি বস্তুকে দেখে থাকি। মূলে এক। মূলে এক হ'লেও বাইরে বিচিত্র। মূলে এক- এটা যেমন ঠিক, বাইরে এক নয় এটাও তেমন ঠিক। এক এবং এক নয় দুটোই রয়েছে। সমান তালে দুটোই চলেছে।

পরিচ্ছেদ — ৩২

এবারে আমি শান্তদার কথা বলতে বসেছি। শান্তদা হয়তো এখনও বেঁচে আছেন। বিখ্যাত সঙ্গীতবিদ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দজী মহারাজ শান্তদার গুরুভ্রাতা। আর একজন—নাম তাঁর স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ—পরে আশ্রম করেছিলেন গঙ্গার ওপারে কোথাও। তিনিও ছিলেন আমাদের শান্তদার গুরুভাই। এইরকম অনেক সন্ন্যাসীই থাকতেন রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে। সেই মঠে আমাদের শ্যামপুকুরবাসী সুকুমার মামাও যেতেন।

রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ। সেই সঙ্গে রামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতি। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য স্বামী অভেদানন্দ প্রতিষ্ঠাতা। সত্রূপানন্দজী অর্থাৎ আমাদের শান্ত মহারাজ সংস্কৃত ব্যাকরণ পাণিনি পড়তেন আমাদের পণ্ডিত মশায়ের কাছে। তিনি বিখ্যাত পণ্ডিত দ্বারিক শাস্ত্রী মশায়ের ভ্রাতা। এঁরা থাকতেন আমার মামার বাড়ীর কাছাকাছি কোনো একটা জায়গায়।

এঁরা অর্থাৎ পণ্ডিত মশাইরা তেমন অবস্থাপন্ন ছিলেন না। তাঁরা দরিদ্র ব্রাহ্মণ। এই কথাটাই বললে পরে ঠিক বলা হয়। যে বাড়ীতে তাঁরা থাকতেন সেটা খোলার বাড়ী। কিন্তু খোলার বাড়ীতে থেকেও তাঁরা

ছিলেন বিদ্যাধনে ধনী। আমি, শান্তদা, চণ্ডী মহারাজ প্রভৃতি যাঁর কাছে পড়তুম তাঁর নাম ছিল জানকীনাথ সাহিত্যশাস্ত্রী। খোলার ঘরেতেই তিনি অথবা তাঁরা মহানন্দে বাস করতেন। জানকী পণ্ডিত মশাই এর বড় ভাই দ্বারিক শাস্ত্রী মশাই নাম করা লোক ছিলেন সে-কথা আগেই বলেছি। তাঁর ছেলে ছিল চিটুদা। এখনও বেঁচে আছেন শুনেছি।

এবারে শান্তদার কথাতে আসি। ওই চতুষ্পাঠী থেকেই কিন্তু শান্তদার সঙ্গে আমার পরিচয়।

সাধারণতঃ টোলে অথবা চতুষ্পাঠীতে পড়ে গরীব ব্রাহ্মণেরাই। অন্যেরাও যে পড়ে না এমন নয়। তবে ওই সকল স্থানে সমবেত হতেন গরীব বিদ্যার্থীরা। যাদের আগ্রহ সংস্কৃত পড়ার দিকে। আবার আর এক কথা বলি। জানকীনাথ সাহিত্য শাস্ত্রী মশাই একদা ছিলেন সরস্বতী ইন্সটিটিউশনের হেড পণ্ডিতমশাই।

এই পণ্ডিতমশাইদের গোষ্ঠী অনেক বিষয়তে ছিল অসাধারণ। তাঁরা ছিলেন তেজস্বী। কিন্তু অনেকে তার মধ্যে অত্যন্ত গোঁড়া। এই সংবাদটা আমরা জানি; একবার এক সাহেব—বিদেশী এক সাহেব সরস্বতী স্কুলে এসেছিলেন পরিদর্শনের কোনো কার্যে। তিনি হাত বাড়িয়ে দিলেন পণ্ডিত-মশাই-এর সঙ্গে, অর্থাৎ আমাদের জানকী সাহিত্যশাস্ত্রীর সঙ্গে hand-shake করতে। পণ্ডিতমশাই তাঁর নিজের হাত বাড়ালেন না। বরঞ্চ গুটিয়ে নিলেন গায়ের কম্বলের মধ্যে। গো-খাদক জাতির সঙ্গে করমর্দন করব? এ হ'তেই পারে না। তাই তিনি পশ্চাদপদ। তাঁর এই কাহিনী সরস্বতী স্কুলেরই কোনো একটি পত্রিকায় মুদ্রিত হয়েছিল। বাস্তবিক-পক্ষে তিনি ছিলেন এই প্রকারের মানুষ। যেমন ছিল তাঁর তেজ, তেমনই ছিল তাঁর দারিদ্র্য। তাঁর কাছে আমি সামান্য কিছুদিন সংস্কৃত ব্যাকরণের পাঠ নিয়েছি। তাই নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি।

হাওড়াতে আমি যেতাম আচার্য বিজয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ী। আগেই ব'লেছি, এই বিজয়কৃষ্ণ আমার জীবনে গভীর হ'তে গভীর রেখাপাত

করেছিলেন। একবার সেই বাড়ীতে যাচ্ছি রাস্তাতে গলির মোড়ে একটা বাড়ীতে দেখতে পেলাম, জানকী পণ্ডিতমশাইএর একখানা প্রকাণ্ড বড় ছবি টাঙানো রয়েছে। আমি ভাল ক'রে দেখতে লাগলাম তাঁরই ছবি কি না। দেখলাম তাঁরই ছবি বটে।

সেই পণ্ডিতমশাই আমাদের সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়াতেন। সামান্য গৃহে নিতান্ত সামান্য একখানা ছোট্ট কাপড় প'রে। কোনোরকমে চললেই হ'ল। বুনো রামনাথের কথা মনে প'ড়ে যায়।

একবার হ'ল সরস্বতী পূজা। আমাকে প্রসাদ পেতে বলেছেন। আমি ব্রাহ্মণ ব'লেই বোধহয় এবং দূর সম্পর্কে কোনো একটা আত্মীয়তা ছিল ব'লে—এইরকম ধরনের কোনো একটা কারণে তিনি বা তাঁরা আমাকে একটু বিশেষ চোখে দেখতেন। পণ্ডিতমশাই নিজে উপস্থিত থেকে আমাকে খাওয়ালেন। আমার স্পষ্ট সব মনে পড়ছে। মনটাও কেমন একটা আত্মীয়তার ভাবে অথবা টানে যেন আবিষ্ট হয়ে উঠছে। তাঁদের বাড়ী তাঁদের বারান্দা, তাঁদের ঘরদোর সমস্তই যেন একটা অন্য জগৎ। আন্তরিকতার স্পর্শে সমস্তটা যেন অন্যরকম। সেই বাড়ী অর্থাৎ আমাদের চতুষ্পাঠী ছিল যেন পুস্তকের একটি আড়ৎ। সেখানেই আমি একটি ইংরেজী বই দেখলাম—স্বামী পরমানন্দের লেখা The path of devotion. রামকৃষ্ণ জগতের পুস্তক। বইখানি আমি পরে আবার সংগ্রহ করেছিলাম। অতি উৎকৃষ্ট বইখানি। কলিকাতার কাছে নাকতলাতে মেয়েদের একটি সুবৃহৎ স্কুল আছে। তার মূল ছিল ঢাকাতে। পরমানন্দস্বামীজী সেইখানেই সম্পর্কযুক্ত। তিনি আবার আমাদের সুবালামায়ের মামা। সুবালামায়ের মা ছিলেন হেমনলিনী দেবী। তাঁর অনেক কাহিনী। সে সব কথা অন্যত্র বলা হয়েছে। সুবালামায়ের ভাই ছিলেন অজিতকুমার দত্ত – প্রসিদ্ধ কবি এবং সাহিত্যিক।

আমাদের গল্প এগিয়ে চলেছে। ঘটনা যেরকম যেরকম মনে আসছে, সেরকম সেরকম ব'লে যাচ্ছি। মাথা মুণ্ডু কিছুই ঠিক থাকছে না কিন্তু।

হয়তো মাথার পরেই হাত বসিয়ে দিচ্ছি। তারপরেই হয়তো একখানা ঠ্যাং। তারপরে কোথাও কিছু নেই, দুটো চোখ। চোখের পরেই দেখতে না দেখতে চুল এসে গেল। চুলের পরে হঠাৎ একটা নাক এসে হাজির। এইভাবে চলেছি। মাথা নেই, মুণ্ডু নেই, হিসেব নেই, নিকেশ নেই। যেমন আসে তেমন বসিয়ে যাচ্ছি। শেষকালে গিয়ে কোথায় যে আমি ঠেকব, সেই কথাটা এইখানে বলতেই পারছি না।

ঠেকব কি ঠেকব না তাও এক সমস্যা। ভাবছি, ঠেকে দরকারটি কি। ঠেকে কাজ নেই।

সমুদ্রে ভাসছি। বেহিসেবী চাল চলছে। ওথোল পাথোল, যেমন তেমন। ভাসছি ডুবছি মোচার খোলার মত। চলেছে আমার নৌকো।

শান্তদার গল্পে ফিরে যাই। সেই যুগে শান্তদা ছিলেন আমার এক আশ্চর্য সঙ্গী রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে একতলার একখানি ঘরে শান্তদা থাকতেন। আশ্রমের অনেকখানি ভার শান্তদার উপরে ছিল। তা থাকলেও শান্তদা তাঁর আপন ঘরখানিতে কতকটা আপন মনে থাকতেন।

স্বামী অভেদানন্দজীর শিষ্য এই শান্তদা। এক আধবার আমি শান্তদার গুরুকে দেখতে গিয়েছিলাম দোতলার উপরে। কিছুক্ষণ ব'সেও ছিলাম। অভেদানন্দজীর দর্শন উপরের তলায় পেলাম বটে, কিন্তু আমার একতলাতেই ভাল জমতো। একতলায় শান্তদার ঘরেই আমার আনন্দ।

এখন ভাবি, তখন শান্তদা আমাকে কি রকম আশ্চর্য ভালোটাই না বাসতেন। প্রায়ই যেতাম। কত কথাই-না হ'ত। দিনের পর দিন গিয়েছি, মাসের পরে মাস। বছরও বোধহয় একাধিক।

আমার কিরকম একটা মনের গতি ছিল, যেখানে গিয়ে পড়তুম সেখানেই আপন হয়ে যেত সবাই। আপন হয়ে যেতে এবং আপন ক'রে নিতে খুব বেশী একটা সময় লাগত না আমার।

পরে এক সন্ন্যাসীর মুখে শুনেছি, শান্তদা অপর এক জাতির। ব্রাহ্মণ তো ছিলেনই না, উচ্চ কোনো বর্ণের হিন্দুও না।

কিন্তু কী চেহারা। উজ্জ্বল গৌর বর্ণ। সুন্দর মুখাকৃতি। মুখ-চোখ দিয়ে ব্রহ্মচর্যের এবং পবিত্র জীবন যাপনের আলোক যেন ঠিকরে পড়ছে।

বাস করতেন কোথায়? বাস করতেন কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের প্রায় উপরে একখানি বাড়ীতে। যে দিক দিয়ে গোয়া বাগানের রাস্তা ঢুকে গেছে, সেই গলিতে প্রবেশ করলে বাঁ দিকে একসারি কি দু সারি বাড়ীর পরে শান্তদা থাকতেন রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে। সেই বাড়ীতে জায়গা অনেকখানি। ভিতরের দিকে বেশখানিকটা খোলা চত্বর। সেই দিকেই ঠাকুর ঘর।

আমি কখনও কখনও হঠাৎ ক'রে গিয়ে উপস্থিত হ'তাম শান্তদার সকাশে। অনেক কাজ তাঁর। কিন্তু তিনি অনেকটা সময় আমার জন্য দিতেন। আমাদের বেশ গল্প চলত। সাংসারিকতার গন্ধবিহীন বিচিত্র আমাদের সেই মিলন। আমি ব'সে ব'সে শান্তদার মুখে কথার পরে কথা শুনতাম।

আমাদের প্রথম দেখাটা হয়েছিল সেই টোলে অথবা চতুষ্পাঠীতে— যেখানে জানকী পণ্ডিতমশাই পড়াতেন। সেইখানে পড়তেন শান্তদারা দু জন। শান্ত মহারাজ এবং চণ্ডী মহারাজ। চণ্ডী মহারাজ পরে তাঁদের আশ্রমে একটা মস্ত বড় স্থান অধিকার ক'রে থাকতেন।

আমার যেন কোনো দিকে কোনো খেয়াল থাকত না। আমি থাকতাম আমার তালে। যে-কথা বলছিলুম, আমার একটা দাবীবোধ থাকত সব স্থানে সর্বদা। এখনও এই ভাবটা আছে। সবখানেই যেন আমার একটা দাবী। সবখানেই যেন সকলকে আমি আপন ক'রে নিতে পারি; আমি সহজেই সকলের আপনার।

একবার মনে মনে ভাবলুম, বাড়ীর থেকে একবার পালিয়েছিলুম তাতে হয়নি। বাড়ীতে আবার চ'লে আসতে হয়েছে। আবার পালাতে হবে।

শান্তদার ওখান থেকেই একটা আশ্রমের খবর পেলাম। ডুমুরদহের

একটা আশ্রম। ভাবলাম সেখানেই যেতে হবে। যে কথা সেই কাজ। অথবা যে ভাবনা সেই কাজ।

একদা ট্রেনে চেপে বসলাম। এবারও হাতে সামান্য পয়সা। পয়সা আমি জোগাড় করতে পারিনি। ভোর-বেলায় শান্তদার আশ্রমে গিয়ে ডেকে তুলে তাঁর কাছ থেকে অল্প কিছু পয়সাকড়ি চেয়ে নিলাম। এবং চ'লে গেলাম ডুমুরদহের আশ্রমে। ট্রেনে ক'রে গেলাম কিন্তু। বোধহয় হাওড়ার থেকেই গেলাম।

আমি ভাবছি, শান্তদার কথা। কি আশ্চর্য ত্যাগী পুরুষ। বেশ ভাল ইংরেজী-জানা মানুষ। কুষ্টিয়া অঞ্চলে কোথায় যেন বাড়ী। আমি যে তাঁর সঙ্গে মিশতুম এতে তাঁর মনে এরকম কোনো ভাব ছিল না যে আমাকে তিনি তাঁর দলে টেনে নেবেন। রামকৃষ্ণ দেবের গল্প এবং সেখানকার অনেক কথা অবশ্যই হ'ত। শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীরও কথা হ'ত না তা নয়। একবার শান্তদা আমাকে উপহার দিলেন রাখাল মহারাজ অর্থাৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দের লেখা একখানি বই—ধর্ম প্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ। বইখানি খুবই ভাল বই।

কিন্তু আমার মন থাকত অন্য জগতে। শ্রীরামকৃষ্ণ অবশ্যই আমাকে অত্যন্ত রকমের আকর্ষণে আকৃষ্ট করতেন। কোন্ সময় যেন একটা স্বপ্ন দেখলুম, রামকৃষ্ণকে নিয়ে। খোলাখুলিই বলছি, শ্রীশ্রীমা সারদা দেবী আমাকে ততটা আকৃষ্ট করতে পারেননি। শ্রীরামকৃষ্ণকে মনে হ'ত এক অলৌকিক দিব্য মহাপুরুষ। অবতার, টবতার নিয়ে আমি বেশী মাথা ঘামাতাম না। অবতারের প্রসঙ্গ আমার মনের মধ্যে তেমন কোনো গভীর আলোকপাত করত না। হয়তো বা আমার বিশ্বাসটাই ছিল অন্য জাতের। সে সব কথা আমার মনেই ধরত না।

পরবর্তীকালের একটি কাহিনী আমার মনে প'ড়ে যাচ্ছে। মা আনন্দময়ীর সঙ্গে প্রথম যুগে যখন কিষণপুর আশ্রমে থাকি, তখন একজন ভদ্রলোক মাঝে মাঝে মায়ের কাছে আসতেন। নাম নরেশচন্দ্র চক্রবর্তী।

এসে পাঁচ দশ দিন কাটিয়ে যেতেন। তাঁর লেখা একখানা বড় বইও আমার হাতে এসেছিল পরে। সেই ভদ্রলোক ছিলেন Chartered Accountant. তিনি ছিলেন রামকৃষ্ণ দেবের পরম ভক্ত। শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীরও পরম ভক্ত তিনি। জয়রামবাটি ইত্যাদি স্থান ঘুরে এসেছেন।

তাঁর মুখে কত কথাই শুনতাম। সমস্তই রামকৃষ্ণ সংক্রান্ত কথা। আবার এদিকে তিনি ছিলেন মা আনন্দময়ীর ভক্ত। তাঁর দীক্ষাগুরু ছিলেন শ্রীশ্রীসারদা দেবী। সেই সূত্রে আমাদের রুমা দেবীর সঙ্গে ওঁর ছিল খুব একটা বেশীরকম জানাশোনা।

শান্তদার গল্প করছিলাম। শান্তদার ঘরে একখানি ছবি ছিল—বিখ্যাত হিটলারের ছবি। হিটলার বিখ্যাত নয়, কুখ্যাত। কিন্তু শান্তদার ঘরে একখানি ছোট ছবি ছিল তাঁর। তখনকার দিনে হিটলারকে নিয়ে কত গল্পগুজব চারিদিকে। হিটলার নাকি সাধন-ভজন করেন। পাহাড়ে না কোথায় তিনি তপস্যায় রত থাকেন। এই রকম সব কথা।

মোটের উপর কথা এই, শান্তদার দলে টানার ভাব একটুও ছিল না মনে হয়। সাধারণভাবে তিনি মনে করতেন আমরাও যেন রামকৃষ্ণ দেবের প্রতি আকৃষ্ট হই। ব্যাস্ ওই পর্যন্ত। এর বেশী কিছু নয়। আমাকে তিনি কত ভাবে কত সহায়তা করেছেন। সঙ্গ দান করতেন। বই দিয়েছেন তো বটেই। একদিন একটা দোকানে গিয়ে খুব বড় একখানি শিবের ছবি উপহার দিলেন। ছবিখানি বেশ বড় এবং কাঁচ দিয়ে বাঁধানো। আমাদের বাড়ীতে সেখানা অনেক দিন ছিল। তারপরে কোথায় গেছে কে জানে।

শান্তদার হাতের লেখা ছিল অতি সুন্দর। মনটিও ছিল অদ্ভুত রকমের ভাল। অনেক পরে—সেণ্ট্রাল পার্কে তখন থাকি—একবার শান্তদাকে গিয়ে বললাম, আমাদের বাড়ীতে আপনি গিয়ে একদিন খাবেন কি? শান্তদা বিনা বাক্য ব্যয়ে রাজী। আমি অত্যন্ত একটা তৃপ্তি লাভ করলাম। রূপবাণী সিনেমার নিকট থেকে যাদবপুর সেণ্ট্রাল পার্কে যাওয়া খুব একটা সহজ ব্যাপার নয়। শান্তদা বললেন, আমি ঠিক চ'লে যাব

অখন। তোমার কিছু ভাবতে হবে না। যথাসময়ে শান্তদা এসে হাজির। কামনা মায়ের মা তখন থাকতেন নিকটেই এক বাড়ীতে। তিনিও দর্শন করতে এলেন। তিনি তো একেবারে মুগ্ধ।

খাওয়ার পরে শান্তদাকে বিশ্রাম করতে দিলাম যমুনারই বিছানাতে একটা কম্বল দিয়ে ঢেকে। গৃহীর বিছানায় সন্ন্যাসী শুলেন। কোনো আপত্তি দেখলাম না। আমি নিজে সেই সব দিনে এই সব বিষয়ে একটু সংকোচ বোধ করতাম।

আমিও তো দীর্ঘকাল আনন্দময়ী মার ওখানে থেকে এসেছি। ছোঁওয়াছুঁয়ির বিচার আমার যে ছিল না তা নয়। অন্য ছোঁওয়াছুঁয়ি সম্বন্ধে আমি কিছু ধার ধারতাম না। তবে মেয়েমানুষের জিনিসপত্র সম্বন্ধে আমার একটা সসংকোচ ভাব অবশ্যই মনের মধ্যে থাকত।

সেই মনে পড়ে, কলকাতায় বাবার কাছে এসে যখন থাকতাম দু এক মাস, তখন আমার মনের মধ্যে কত বাছ বিচার। আমার ধরনে আমারটা। ছাদের উপরে মেয়েদের শাড়ি ঝুলছে আমার গায়ে ঠেকে গেলেই নিতান্ত একটা অসুবিধা বোধ করতাম। ঠেকল কেন? না ঠেকলেই ভাল হ'ত। এইরকম। এমন কি, কিছুদিন রাত্রিতে গিয়ে শুয়ে থাকতাম কোনো একটা মন্দিরে। বাড়ীতে শুতে পারতাম না। আমাদের বাড়ীর কাজের মেয়ে খুদু একটা মন্দির ঠিক ক'রে দিল। আমি রাত্রিতে গিয়ে শুয়ে থাকব, এই উদ্দেশে।

আবার শান্তদার কথাতে আসি। আমার পনের, ষোল বছর বয়সে শান্তদার সংস্পর্শ আমার জীবনে এক অপরূপ বস্তু হয়ে দেখা দিয়েছিল। বড় সুন্দর, বড় আশ্চর্য, বড়ই মহান।

দেরাদুনে কিষণপুর নামক অঞ্চলে গিয়ে ছিলাম কিছুদিন। অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা জায়গা। সেই আশ্রমেই একজন আমার একখানি ছবি তুলেছিল। Background-টাকে পরিবর্তিত ক'রে সেই ছবিখানি ওরা এখন টাঙিয়ে রেখেছে।

এই কিষণপুরে আমি একদিন পায়চারি করছি এবং পিওনের জন্য অপেক্ষা করছি, শান্তদার চিঠি আসবে। আমার উৎকণ্ঠা সেইখানে।

মা আনন্দময়ী ছিলেন। কি ক'রে যেন জানতে পারলেন, আমি চিঠির জন্য ছট্ফট্ করছি। হয়তো আমিই ব'লে থাকব। কিন্তু তাঁর এটা ভাল লাগল না। তিনি বললেন, সাধু হয়েছ আবার চিঠির জন্য ছট্ফট্ করা কেন। সাধুর পক্ষে এটা খুব ভাল জিনিস নয়।

শান্তদা আমার অনেকখানি ছিলেন সেই বিষয়ে কোনো কথাই নেই। কিন্তু তাঁর সব কিছুই যে ভাল লাগত এমন নয়। তিনি আরশোলা দেখতে পারতেন না। আরশোলা দেখলেই মেরে ফেলতেন। আমার সামনেই একদিন মেরে বসলেন দু একটা আরশোলাকে। হাতে তাঁর ঝাঁটা ছিল। সেই ঝাঁটার বাড়িতেই আরশোলা কাৎ এবং নিপাত। আমি সহজে মেনে নিতে পারলাম না। তবু এখন বুঝতে পারি, শান্তদা আমার জীবনে ছিলেন অনেকখানি।

পরিচ্ছেদ—৩৩

একবার কোথায় যেন একটি ছেলের দেখা পেলাম। খুব অল্প বয়স। ষোল সতেরর বেশী হবে না। ছেলেটির মুখশ্রী ভারি সুন্দর। আবার এদিকে মনে সুন্দর বৈরাগ্য। ছেলেটি আমাকে বললে, আমি থাকি স্কটিশচার্চ কলেজের হোস্টেলে। আমাকে বললে, আপনি যাবেন সেখানে। আমারও যেরকম ধরনের ভাব, ওরও সেরকম ধরনের ভাবভঙ্গী। ওর নাম সত্যকৃষ্ণ ভট্টাচার্য। পরে শুনেছিলাম, দিনাজপুরে না কোথায় সে গিয়ে থাকতো। সেখানে একটি উন্নত সাধুপুরুষের দেখা সে পেয়েছিল। নাম তাঁর নাকি গদাধর মহারাজ।

সে যা হোক আমি তার কথা অনুসারে স্কটিশচার্চ কলেজের হোস্টেল বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হ'লাম একদিন। ছেলেটির দেখা পেলাম। সে পড়াশুনো করে আর তার সঙ্গে ধ্যানধারণাও করে। একটি ঘরে তার সুন্দর ছিমছাম একটি বিছানা অথবা সিট। ওরই মধ্যে একপাশে বসিয়েছে রামকৃষ্ণের ছবি। আর কার ছবি তা মনে নেই।

অনেক আলাপ হ'ল। খুব ভালই লাগল। তখন তো বেশ ভালই লেগেছে। আমার মনটাতে ও টেনেছে। সমস্তই ঠিক। পরে ওর কথা অনেক ভাবতাম। আবার ঘুরতে ঘুরতে দেখাও হয়েছিল। আমার সেই অপরিণত বয়সে সে আমার অন্তরকে কিছুটা আকর্ষণ ক'রে নিয়েছিল। এও শুনতে পেয়েছি সে রামকৃষ্ণ মিশনে একজন বিশেষ ব্যক্তি। অথবা নামকরা সাধু। আমার বন্ধু ব'লেই তাঁকে সে ব'লে বললাম। নচেৎ সে একজন সম্মানিত সন্ন্যাসী। এখনও কি সে বেঁচে আছে? জানি না।

শান্তদার কথা এখনও কিন্তু শেষ হয়নি। আমি শান্তদাকে একখানা চিঠি লিখেছিলুম সত্রুপানন্দ পুরী ব'লে। শ্রীরামকৃষ্ণ তো পুরী সম্প্রদায়ের। তোতাপুরীর তিনি তো শিষ্য। তাই লিখেছি সত্রুপানন্দ পুরী। শান্তদার রসিকতা শুনুন। তিনি করেছেন কি, একখানা খামের মধ্যে ঘি-এর একটা বিজ্ঞাপন পাঠিয়ে দিয়েছেন। অভয়াঘৃত। আমি পেলাম কৌতুক এবং আনন্দ দুটোই। এইভাবে শান্তদার কাছে পেতাম অকৃত্রিম ভালবাসা এবং সুগভীর স্নেহপ্রীতি। এখন আর তাঁর কাছ থেকে বিশেষ সাড়াশব্দ পাই না। তিনি যেমনই থাকুন অথবা যেখানেই থাকুন, আমি তাঁকে প্রণাম ক'রে তাঁর প্রসঙ্গটা এখনকার মত শেষ করছি।

একবারের কথা বলছি। দক্ষিণ কলকাতাতে থাকি। কলকাতা কলিকাতা দুটোই লিখি, কখনও ভাবি এটা লিখি, কখনও ভাবি ওটা লিখি। এইভাবে এই বইতে কলকাতা এবং কলিকাতা দুটোই চলছে।

একদিন খবর পেলাম এক সাধু এসেছে। নাম তাঁর হংসমহারাজ। ঢাকুরিয়ার সোনা মার সঙ্গে তাঁকে দেখতে যাব। তাঁকে দেখতে চ'লে গেলাম কোনো একজন অবাঙালী ধনী ব্যক্তির বাড়ী। উপর তলায় দেখলাম, তাঁকে দর্শন করবার জন্য কিছু লোক জড়ো হয়েছে। হংসমহারাজ এলেন সেখানে। ইচ্ছা মাও গিয়েছিলেন, এ কথা আমার মনে আছে।

হংসমহারাজের বয়স তখন অত্যধিক। শতাধিক তো হবেই ব'লে মনে পড়ছে। কিন্তু সব শোনা কথা। কথাবার্তা তেমন হ'ল না। হংসমহারাজের বয়স বেশী, শরীর অপেক্ষাকৃত স্থূল। সে যা হ'ক, একজন নামকরা সাধু মহারাজকে তো দেখলাম। এই হংসমহারাজের পাত্তা পাওয়া গিয়েছিল একবার এক কুম্ভমেলাতে।

স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দজী থাকতেন কলকাতায়। তাঁর কথাতেই এবার চ'লে আসি। অনেকগুলো ভালো ভালো গ্রন্থের লেখক তিনি - এ রকম আমার মনে পড়ে। সবাই জানে, তাঁর জপসূত্রম্ গ্রন্থের কথা। অবিস্মরণীয় গ্রন্থ। শুনেছি গোপীনাথ কবিরাজজী বলেছেন, এইরকম গ্রন্থ নাকি এক সেঞ্চুরীর মধ্যে লেখা হয়নি। সংস্কৃতে লেখা সূত্র-গ্রন্থ। আমি বলছি, এই গ্রন্থখানি গ্রন্থ-জগতের এক বিস্ময়। গোপীনাথ কবিরাজজী তো আমার আচার্যদেব, বিশ্ববিশ্রুত পণ্ডিত। তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে আমি কিছু বলতে চাই না। তবে আমার কথা আমি আপন মনে আমার মত ক'রে বলছি। এমন্ গ্রন্থ আমার তো আর চোখে পড়েনি।

তবে একটি কথা। একথা আমারই কথা। ওই গ্রন্থ নিশ্চয় অদ্ভুত গ্রন্থ। এ বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহই নেই। কিন্তু আমার মনে হয়

জপ বস্তুও রয়েছে, জপের ক্ষেত্রে জপ রয়েছে। সে তো রয়েছেই। কিন্তু আরও অনেক কথাও তো রয়েছে। অনেক কথা, অনেক পথ, অনেক ধারা, অনেক ভাব, অনেক কিছু। জপ ছাড়াও অনেক কিছু রয়েছে। অনেক চিন্তা, অনেক ভাবনা এবং অনেক অগ্রগতি।

একটা দরকারি জিনিস ঈশ্বর-প্রণিধান। ঈশ্বর, ঈশ্বর আর ঈশ্বর। ঈশ্বর বলতে কাকে লক্ষ্য করছি? ঈশ্বর বলতে সেই পরম পুরুষ এক মহাব্যক্তিকে লক্ষ্য করছি। সেই তাঁকেই লক্ষ্য করছি। তমেব চাদ্যং পুরষং প্রপদ্যে — এই কথা ব'লে গীতা যাঁর প্রসঙ্গ ঘোষণা করেছেন সেই তাঁরই কথা আমি এখানে ঈশ্বর ব'লে উল্লেখ করি।

ঈশ্বর। এই জগৎ তাঁর ঐশ্বর্য। তাঁর মাধুর্যের আর একটা জগৎ আছে। তাঁর বিভিন্ন দিক নিয়ে আরও অনেক জগৎ আছে। সব নিয়ে তিনি বিচিত্র।

প্রত্যগাত্মানন্দজীর কথা হচ্ছিল। তিনি থাকতেন গড়িয়ার সন্নিকটে বড় রাস্তার উপরে একটি বাড়ীতে। অনেক দিন আগের কথা তো। আমি তো ছিলাম সাধুপাগল লোক। কোনো সাধুর কথা শুনেছি, অমনি আমাকে যেতেই হবে। এখন আর আমার সেই ভাব নেই। সাধু আসলেই দৌড় দেওয়া।

এরকম আমি যেতাম প্রত্যগাত্মানন্দজীর কাছে। মাঝে মাঝেই যেতাম। শুনতাম গোবিন্দা অর্থাৎ ডঃ গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় জপসূত্রম্ ব্যাখ্যা করেন। লোকে যেমন গীতা ভাগবত ব্যাখ্যা করে, তেমন তিনি ব্যাখ্যা করেন আশ্চর্য গ্রন্থ জপসূত্রম। গোবিন্দগোপালবাবুও মহান ব্যক্তি। জপসূত্রম্‌ও অপরূপ গ্রন্থ। সেই গ্রন্থ গোবিন্দগোপালের ব্যাখ্যা করা — সেও এক অদ্ভুত ব্যাপার। আমি শুনিনি কিন্তু নিশ্চয়ই এক অদ্ভুত ব্যাপার। গোবিন্দার কৃত অন্য প্রসঙ্গ শোনবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। আমি বলছি, গোবিন্দা নিশ্চয় জপসূত্রম্‌কে ব্যাখ্যা করতেন আশ্চর্যরকমে।

একদিন গিয়েছি সেই স্বামীজীর কাছেই। বোধহয় সেই দিন ছিল সরস্বতী পূজা। আমি গাইলাম আমার সেই গানখানি—ব্রহ্মদেবী মহাদেবী সরস্বতী বীণাপাণি। যতদূর মনে হয় আমি যেতাম সেন্ট্রাল পার্ক থেকে। মনে এবং জীবনে বইছে তখন প্রবল স্রোত। এবং খেলছে তখন উত্তুঙ্গ সব ঢেউ। এই স্রোত আর ঢেউ জীবনভরই আমার চলেছে। সেই সময়ে হয়তো প্রবল বেগ আর গভীর আবেগ। ব্যাস্ এই পর্যন্তই।

একদিন বেরিয়েছি, কিন্তু স্বামীজীকে ধরতে পারলাম কোথায় আর এক জায়গায়। স্বামীজী অনেক সময় থাকতেন মাস্তুদির বাড়ীতে। মাস্তুদি গোবিন্দগোপালবাবুর ভগ্নী। শান্তিদিকেও জানতুম, মাস্তুদিকেও জানতুম। তুজনেই খুব আশ্চর্য মহিলা। আমার যেন বড়দিদির মত অথবা মায়ের মত।

পরিচ্ছেদ—৩৫

গল্পের সঙ্গে আমিও গড়িয়ে চলেছি। গল্প যেদিকে আমিও সেদিকে। একবার তখন মা ছিলেন মধ্যপ্রদেশে জঙ্গলের মধ্যে একটা বাড়ীতে। চতুর্দিকে শুধু জঙ্গল। মাঝখানে একটি ছোট্ট বাড়ী। বাড়ীটি সুন্দর। বিলাস ভবন নয়, তবে বেশ থাকবার উপযুক্ত। মা আছেন, দিদি আছেন আর আমি আছি। এই তিন জন সেখানে দিন কাটাই।

আমি তখন একটি সাধু। সাধু কি না জানি না। তবে সাধু-বেশে থাকি এবং ত্যাগীর মত জীবন যাপন করি।

এইসব বিষয়ে আমি হিসেব নিকেশ করতে চাই না। আমি যা আমি তাই। এইটেই ভাল এবং এইটেই সত্য। তবে তখন হিন্দু সমাজে গোটাকতক আদর্শ ধ'রে থাকবার চেষ্টা করি মাত্র। ওই পর্যন্ত। আর

কিছু আমি জানি না। সকল বিষয়ে এত কৈফিয়তও দিতে পারব না।

মধ্যপ্রদেশের সেই জায়গায় মা আমাকে বললেন, যা গিয়ে ভিক্ষে ক'রে খেয়ে চ'লে আয়। কিন্তু শুধু কৌপীন প'রে যাবি।

যাই কথা তাই কাজ। কৌপীন প'রেই ভিক্ষা ক'রে এলাম। এইসব প্রসঙ্গ অন্যত্র লেখা হয়েছে মনে পড়ে। একটা কথা কিন্তু লিখতেই হয়। একটা কাহিনী।

আনন্দময়ী মার কাছাকাছি আমি থাকি। কাছে কাছে, অতি কাছে। একটা জংলা জায়গায় অন্ধকারে মা আমাকে বললেন, কুঁজোর থেকে জল গড়িয়ে দিতে। জল গড়িয়ে দিলুম। কিন্তু জলের মধ্যে ছিল একটা কাঁটা। গাছের কোনো কাঁটা। অন্ধকারেই, ভাল ক'রে না বুঝে জলটা মাকে খাইয়ে দিলাম। আমি নিশ্চয় অন্যত্র ব'লেছি, মা নিজের হাতে কিছুই খেতেন না। খাদ্যও না, জলও না।

জল তো খাইয়ে দিলুম। জলের সঙ্গে কাঁটাটা গিয়ে গলায় আড়া-আড়িভাবে বিঁধে গেল। গাছের কোনো কাঁটা। চেষ্টা চরিত্র চলতে লাগল কাঁটাটাকে বের করবার জন্য। টর্চের আলো, সন্না ইত্যাদির সাহায্যে চেষ্টা চলল। কিন্তু হা হতোস্মি। কিছুই হ'ল না। মায়ের গলাতে কাঁটা যেমন ছিল তেমনই রয়ে গেল। তারপরে আর কি। ডাক্তার ডাকতেই হ'ল। ডাক্তার এসে ভোরের দিকে গলা থেকে সেই কাঁটা বের করলে। এই ঘটনা কোথায় ঘটেছিল আমার ঠিক মনে পড়ছে না। তবে ঘটেছিল এটা ঠিক। এবং মায়ের ধৈর্য এবং সহনশীলতার আমরা চাক্ষুষ আর একটা পরিচয় পেলাম।

এ সব আমরা নিত্য দেখেছি। মাকে তেমন মানি আর না মানি, মায়ের এইসব লীলা অথবা খেলা অথবা কাণ্ডকারখানা চোখের সামনে দেখতে পেতাম অজস্রবার। এ সব দেখে মাকে বারংবার প্রণাম না জানিয়ে থাকা যায় না।

পরিচ্ছেদ — ৩৬

আবার সেই ছেলেবেলার কথা। ছেলেবেলায় আমার তিন চার বছর বয়স থেকেই আমরা মাঝে মাঝে কলকাতার বাইরে যেতাম বেড়াতে। লোকে যাকে বলে outing. আবার কলকাতার মধ্যেও কোনো জায়গায় বড় রকম কিছু ঘটলে আমরা যেতাম দেখতে। অন্যদিকের কথা ছেড়ে দাও। আর্ট সম্বন্ধীয় exhibition হচ্ছে কোথাও। অমনি চলো, দেখতে চলো। নাগালের মধ্যে হ'লে দেখতে যাবই।

তখন কলকাতা ছিল ছোট। এখন কিন্তু কলকাতা অনেক বড়। সেবার বিডন স্কোয়ারেই রবীন্দ্রনাথের কতগুলো ছবির প্রদর্শনী সজ্জিত ক'রে রাখা হয়েছিল। যতদূর মনে পড়ে, কিছু কিছু পয়সার বিনিময়ে দেখতে হবে।

আমার মা এইসব ব্যাপারে খুব উৎসাহ এবং আনন্দ লাভ করতেন। তিনি গেলে আমরাও যেতাম। আমরা বিডন স্কোয়ারে রবীন্দ্রনাথের আপন হাতে আঁকা সব ছবি দেখে এলাম।

কোনোটার নাক খুব উঁচু। কোনোস্থানে মুখের এক দিকটা বেখাপ্পা রকমের লম্বা। দেখে গৌরব বোধ করতাম। কিন্তু মনে মনে তেমন একটা পরিতৃপ্তি পাইনি। আবার কখনো বর্মার ছবি দেখতে পেতাম। মোটামুটি ভাবে সুন্দর বটে, কিন্তু বর্মার ছবিতে তেমন একটা আনন্দ নেই। বরঞ্চ আনন্দ পেয়েছি পরবর্তীকালে নন্দলাল বসুর আঁকা ছবিতে।

কিন্তু সত্যিকারের আনন্দ রয়েছে প্রাকৃতিক দৃশ্যে। এমন ছবি কে এঁকেছে। এমন ক'রে কে আঁকলে। ক্ষণিকের ছবি বটে, কিন্তু অনেকদূর পর্যন্ত যায়।

আর একবার গেলাম বিডন স্কোয়ারেই পুতুলের মাধ্যমে দেশের নেতাদের কাহিনী দেখতে। সেও সুন্দর। গান্ধীজীর অসুখ করেছে ভারতমাতা করুণ চোখে তাকিয়ে মাথা নাড়ছেন। অথবা নিজেই এদিক

ওদিক করছেন — এইসব কাহিনী। আমার ভাল লাগত বটে, কিন্তু মনের মধ্যে তেমন একটা সাড়া পেতাম না।

একবার একটা মিছিল যাচ্ছে। বেশ লম্বা মিছিল। একটা বড় রাস্তা দিয়ে মিছিল চলেছে তো চলেছে। শ্লোগান দিচ্ছে স্বদেশীয়ানার শ্লোগান। আমি কোথা হ'তে এসে লাইনের মধ্যে সামিল হয়ে গেলাম। উড়ে এসে জুড়ে বসলাম যেন। তারপরে শ্লোগান আমি দিতে আরম্ভ করলাম। আমি একবার বলছি, সবাই একবার। উৎসাহ এবং উদ্দীপনা দেখে কে।

আমি ভাবতুম, দেশের কাজেই ঝাঁপিয়ে পড়ব। সেই কবে যেন একখানা বই আমাদের হাতে এল। নাম ছেলেদের কংগ্রেস অথবা ছেলে-মেয়েদের কংগ্রেস। ঠিকমত নামটা আর মনে নেই। তবু আমরা যে কিছু কিছু পড়তুম এবং কিছু কিছু বুঝতুম এবং কিছু কিছু বোধ করতে পারতুম সে কথা আমার মনে আছে।

কলকাতায় তখন গরম আবহাওয়া। স্কটিশচার্চ কলেজিয়েট স্কুলের সামনে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে একদিন দাঁড়িয়ে আছি — একটি ভদ্রলোক কতগুলো লাল কাগজ ছড়িয়ে দিলে রাস্তাতেও এবং ট্রামের মধ্যেও। কাগজের উপরে বেশ বড় বড় লাল অক্ষরে লেখা — রক্ত চাই। অর্থাৎ দেশের জন্য রক্ত দিতে হবে। এই জাতীয় একটা ভাব কাগজের থেকে এবং কাগজের ভিতরকার অক্ষরগুলো থেকে যেন ঠিকরে পড়ছে। সেইসব কথা বেশ ভাল ক'রেই বুঝতে পেরেছিলাম। সেইজন্যেই তো এখনও সব মনে আছে।

এবারে গৌড়ীয় মঠের প্রসঙ্গ। বাগবাজারের গৌড়ীয় মঠ। আগের থেকেই জানতাম যেন। একদিন রাত্রে ঠাকুরদা আমাদের নিয়ে চললেন সেইসব দর্শন করতে। কি একটা উৎসব ছিল মনে পড়ে। আলো ঝলমল্ অনেক সব কাণ্ড। কিন্তু এসব আমার মন তেমন একটা স্পর্শ করেনি।

আমাদের পাড়ার সেই সঙের মত ব্যাপার। একটা ছোট রাস্তাতে

দুদিকে রোয়াকের উপর সঙ্ সাজানো হ'ত। খুব হৈ চৈ ক'রে অনেকে দেখত। এটাই কি জেলে-পাড়ার সঙ্? বাক্সে পুতুলও আছে তার মধ্যে। বড় বড় পুতুল সব। প্রায় পুতুলই হাত দুই তিন লম্বা। পরে ঠাকুর রামকৃষ্ণের বইতে পড়েছি ঃ একজন এইসব দেখছিল। আর একজন তাকে ডাকছে, ওরে ওরে ওদিকে কি দেখছিস, এদিকে আয়, এদিকে দেখবি আয়। সেখানে এক বেশ্যা তার উপ-পতিকে ঝাঁ্যাটা মেরে তাড়িয়ে দিচ্ছে সেই দৃশ্য। মানুষ কিসে আমোদ পায়। এই আর কি।

শান্তিনিকেতনে ফিরে যাই। তৃণার জ্যাঠামশাই না কে একটি গল্প বললেন। গল্পটি নিতান্ত গল্প। তবু সেটা গল্প ক'রে মজা পাওয়া যায় না এমন নয়। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়েছে। রবীন্দ্রনাথকে সুন্দর সজ্জিত খাটিয়াতে ক'রে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। পথের ধারে এক রেষ্টুরেণ্টে দুটি ছোকরা বসেছিল। তারা তত দুঃখে মুহ্যমান হয়নি। একজন শুধু বললে, সাথে ক'রে এনেছিলে কি এক জিনিস, মরণে তাহাই তুমি ক'রে গেলে ফিনিশ।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুমিছিল ভীড়ে ভাড়াক্কার। সেইখানে সেই অবস্থায় এই গল্পটা কি রকম ভাবে সম্ভব সে কথা আমার বোধগম্য নয়। এ তো গল্প। এ তো ঘটনা নয়, এ তো গল্প। আমি শুধু বলছি, এইরকমের কোনো কিছু ঘটা সম্ভব নয়। বিলকুল অসম্ভব। এই প্রকারের মন্তব্য ক'রে এই প্রসঙ্গটিকে আমি এইখানে চাপা দিলাম।

একখানা বইতে দেখতে পেলাম সত্য ধর্ম ব'লে একটি ধর্মের কথা। অনেকটা হিন্দুধর্মের মত। সুন্দর সুন্দর ভাব, ভাল ভাল সব কথা। হিন্দুধর্মের অবান্তর সব গল্প এবং প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে সার গ্রহণের প্রয়াস।

এই ধর্মটি এই দেশে প্রচার করেছিলেন শ্রীযুক্ত গুরুনাথ সেন নামে একজন মনস্বী ব্যক্তি। পশ্চিমবঙ্গে কিছু কিছু ছড়িয়েছিল এই ধর্ম।

ঘটনাচক্রে এই ধর্মটির কথা আমার কাছে এসে পৌঁছয়। আমি তখন কাশীতে। পরে কলকাতায় এসে এই ধর্ম সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে খুব

আলোচনা চলে।

অম্বরীশ ডাক্তার নামে একজন ভদ্রলোক আমার কাছে আসতেন সম্প্রতি। এখনও অর্থাৎ ১৯৮৮ সালে তিনি বেঁচে আছেন। তিনি থাকেন এই যাদবপুর অঞ্চলেই। তিনিও ওই সত্যধর্ম নামক ধর্মের ধর্মী। তাঁর কাছেও অনেক কথা আমি শুনেছি ওই ধর্ম সম্বন্ধে।

আমি তো একেরই বিচিত্র খেলা দেখতে পাই। সর্বত্র একের মহিমা। এক শুধু এক। আমি লিখেছি, "একজন শুধু একজন।" দুই বিহীন এক। সেই এককে একজন বলি অনেক সময়। দুই তিন জন নয়, কেবল-মাত্র একজন। আমার কাছে সেই একজন।

খাতির ক'রে এবং আদর ক'রে আমি ব'লে থাকি একজন। আর তাছাড়া একে একজন বললে কিছু যে দোষ হয় তা তো মনে করি না। সেই ব্যক্তি একও বটে, একজনও বটে, এক ব্যক্তিও বটে, একটি আলোকও বটে, আবার একটি প্রকাশও বটে।

তার উপমা কেবলমাত্র সে নিজে। তার উপমা আর তো খুঁজে পাওয়া যায় না। তার তুলনা আর কোথাও নেই। তার তুলনা শুধু সে।

একটি কথা বলি, সেই একজনের কথা পেলে আমার আনন্দ হয়। তার কথা এলেই হ'ল। তার কথা আমার জীবনে উঠলেই আনন্দ।

আমার জীবনের সার কথা সেই একজনের কথা। অন্য যা কিছু আছে সমস্তই অসার কথা—একথা বলা যায়। অন্য কথা আমার জীবনে কি কাজে লাগবে।

তাই আমার কাছে ঘুরেফিরে এসেছে এবং এসে থাকে সেই পরম আপন একজনের কথা। তাঁর কথা আমাকে ধ'রে রেখেছে। আমি যে তাঁর কথাকে ধ'রে রয়েছি ঠিক তা নয়। বস্তুগত ভাবে বলতে গেলে, হক কথাটি বলতে গেলে এই কথা বলতে হয়—সেই তাঁর কথা বরং আমাকে ধ'রে রাখতে কসুর করেনি।

আমার দিকে হাজার কসুর আছে। এক কথায় আমি তাঁর কিছুই

করিনি। কিন্তু সে আমার সব করেছে। সে আমার সকল কিছু করেছে এবং করছে। হ্যাঁ এখনও করছে। ক'রেই চ'লেছে।

আমার কথা আমি যেমনটা বুঝেছি তেমনটা এইখানে কিছু প্রকাশ করি। অনেকটা প্রকাশ করিনি তা নয়। আমি আমার কথা কিছু কিছু বলতে শুরু করেছি বছর কয়েক হ'ল। আমার কথা আমি যদি না বলি আর কে বলবে। আমার কথা বলতে হ'লে আমাকেই বলতে হয়।

অসুবিধা আছে জানি। আর একটা দিকও আছে। সেই দিকটার কথাও চিন্তা করতে হয়। আমার কথা আমি কেমন ক'রে বলব। বলতে গেলে একটুখানি অসুবিধা যে হয় না তা নয়। মাঝখানে আমার পক্ষে বলাটাই একটা মুশকিলের ব্যাপার হয়ে উঠেছিল।

অথচ আমি ব'লেই চলি। আমার জীবনে বলবার মত কথা যা আছে তার মধ্যে সর্বপ্রথম স্থান সেই একজনের কথার। বলতে গেলেও আসে বাধা এবং সংকোচ।

তবু আমাকে বলতেই হবে। আমি তখন দিল্লীতে অমল সেন মহাশয়ের বাগানে থাকি। মস্ত একটি বাগান। চারিদিকে ফুলের সমারোহ। ফুল আব গাছ, গাছ আর ফুল। গাছপালারই আতিশয্য। সেই বাগানে একদিকে ছিল একটি মোটর গ্যারেজ। তার মধ্যেই আমি আমার ডেরা ক'রে নিয়েছিলাম।

আনন্দেতে বাস করি সেই বাগানে। ওইখানেতেই আমার সঙ্গে ভোরবেলায় যোগ দিতেন অমল সেন মশাই। অতি উত্তম মানুষ। তাঁর সঙ্গে একসঙ্গে পড়তাম একটি উপনিষদ রোজ একটু একটু ক'রে। পড়া চলত। পড়া ক্রমে শেষ হয়ে গেল।

অমল সেন মশায়ের স্ত্রীকে আমি দিদি ব'লে ডাকতুম। দিদির সংখ্যা তো আমার কম না। গুরুপ্রিয়া দেবী আমার দিদি—আদি এবং অকৃত্রিম। অর্থাৎ কি না প্রথম দিকেই গুরুপ্রিয়া দেবী।

তার পূর্বেও কি দিদি নেই? অবশ্যই ছিল। আমার বাল্যকালে

প্রথমে এক পিসতুতো বোন আমার দিদির মত ক'রে তাঁর স্থান ক'রে নেয়।

সেই পিসতুতো বোনের নাম রাণু। ঠাকুরদাদা শ্রীকালীমোহন বিদ্যারত্ন শেষ দিকে পালন করতেন তাঁর মেয়ের মেয়ে এই দিদিকে। তার মানেই আমার পিসতুতো বোন।

আমার থেকে কিছু বড় ছিল বটে, কিন্তু আমি এখন তার খবর আর কিছুই জানি না। এখন একেবারে সম্পর্করহিত। কে জানে কোথায় কেমন আছে।

আমি অমলবাবুর স্ত্রীকে দিদি ব'লে ডাকতাম। কিন্তু ওই পর্যন্তই। আর কোনো সম্পর্ক অথবা ব্যবহার বেশী ছিল না।

হঠাৎ একদিন অমলদা আমাকে একখানা বই উপহার দিলেন। Voice of heaven. অবশ্য পুরোনো বই। পুরোনো হ'লেও চমৎকার বই। আমি অনেক দিন বইটিকে সঙ্গী ক'রে রেখেছিলাম। টুকরো টুকরো কথা। অমৃত-ঝরা সব কথা। বইটার কথা এখনও মনে পড়ে। কোথায় গেছে সেই বইটা।

স্তরের পরে স্তর। এক স্তর যায়, আর এক স্তর আসে। কত বই এল আর গেল। সবাই যার যার সঙ্গ দিয়ে গেল। Voice of heaven নামক বইটা আমাকে স্বর্গরাজ্যের কথা শুনিয়ে গেছে।

পরিচ্ছেদ — ৩৭

এবারে আর এক পরিচ্ছেদে একটি নতুন প্রসঙ্গ। প্রসঙ্গ নতুন নয়। প্রসঙ্গ পুরাতনই প্রসঙ্গ। তবে এই প্রসঙ্গটা আমার খুব প্রিয় প্রসঙ্গ, আমার কাছে নতুনের মত লাগে।

প্রসঙ্গটা সময়ের প্রসঙ্গ। সেই প্রথম কবে যেন শুনেছিলুম এই

প্রসঙ্গের কথা। তখন আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলুম। সময়ের কথা নিয়ে কে কবে বলেছে অথবা শুনেছে। বলেছে নিশ্চয়, তবে কমই বলেছে। যে যার ধরনে বলেছে। আমি এখানে আমার ধরনে বলছি। সময় একটা অদ্ভুত বস্তু। হঠাৎ একদিন শান্তিনিকেতনে তৃণা প্রভৃতির সামনে সময়কে ধ'রে কথা বলছিলুম। এরকম ধরনের কথা আমি বলতুম। যেমন ট্রেনে ক'রে আসতে আসতে নীরাজনা দেবীর সামনে কিছু সৎ প্রসঙ্গ করছিলুম একদা। নীরজনা মা অতি উচ্চদরের একটি আশ্চর্য শিক্ষিতা মহিলা এবং বুদ্ধিমতী মহিলা। এই সেদিন নীরাজনার কন্যা ক'লকাতা হাইকোর্টের ব্যারিস্টার রুমা পালের কাছে তার মায়ের কথা লিখেছিলুম।

এইবারে আসি সময়ের প্রসঙ্গে। কথাটা এই, সময় কি বস্তু। সময় সম্বন্ধে আমাদের একটু স্পষ্ট ধারণা প্রয়োজন। সময়টাকে কি ভাবে বোঝা যায়। অর্থাৎ সময়ের ধারণা কেমন ক'রে মনের মধ্যে ফুটে ওঠে। বলতে হয়, ঘটনার দোলায় দোলায় সময় যেন দুলতে থাকে। আবার ঘটনার পরে ঘটনার আবির্ভাবে সময় বস্তুটা রূপ নিতে থাকে। ঘটনা ঘটে। ঘটনার পরে ঘটনা। এবং সঙ্গে সঙ্গে সময়ের একটি conception এসে পড়ে আমাদের সকলের অন্তরের মধ্যে।

এইভাবে সময় আসে। এইভাবে সময় ফুটে ওঠে আপন ছন্দে। বিশ্ব জগৎ আছে, তাই সময়ও আছে। সব আছে, সেইখানে সময়ও আছে। সময় যেন ছুটে চলেছে। সকল অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সময় যেন এগিয়ে চ'লে যাচ্ছে।

সময় কোথা থেকে কোথায় যায়? সেই কথা কে বলবে? সেই কথা যে বলার বাইরে। সময় কোনোখান থেকে কোনোখানে যায় না। তার যাওয়াও নেই, আসাও নেই।

সে শুধু নাচে। বিশ্বজগতের একটা ছন্দে সে নাচতে থাকে। আপনা আপনি নাচতে থাকে। বিশ্বজগৎও নাচে, সেও নাচে। কিন্তু সে নাচতে থাকে তার নিজেরই ছন্দে। অপর কারও কিছু কথা বলবার

অপেক্ষা নেই। সে নেচে নেচে এগিয়ে চলে।

এগিয়ে চলাটাই তার স্বভাব। চলা থাকলেই এগিয়ে চলা। যেখানে চলা সেখানে কোনো না কোনো দিকে এগিয়ে চলা।

সে এগিয়ে চলছে বটে কিন্তু তার কোনো লক্ষ্য নেই। কোনো একটা জিনিসকে লক্ষ্য ক'রে যে সে এগিয়ে চলছে তা নয়। সে নাচেও বটে, এগিয়ে চলেও বটে, কিন্তু ওইখানেই পরিসমাপ্তি। অর্থাৎ ওই কথার মধ্যেই তার অস্তিত্বের শেষ কথা।

তাহ'লে কি দাঁড়াল। সময়ের গতি অনাদি হ'তে অনন্তে। সেই গতিতে সে নৃত্যপরায়ণ। এবং এই নৃত্য চিরন্তন নৃত্য। এই নৃত্য কখনও থেমে যায় না। এই নৃত্য চলছে এবং চলবে।

রূপকের অলংকার না পরিয়ে এই নৃত্যকে লক্ষ্য করা যায়। তবে অনেক সময় আমরা আমাদের মনের মত অলংকার পরিয়ে নিই। এইভাবে আমরা সময়ের গল্প একটু বলবার চেষ্টা করছি। একটু বলেছি, আরও একটু বলব।

সময় আমার কাছে একটা বড় রকম ধ্যানের বস্তু। তার মানে এই, সময়কে নিয়ে চিন্তা করতে এবং কথা বলতে আমি খুবই ভালবাসি। আমি সময়ের দেখা পেয়েছিলাম সেই কোন্ যুগে। দেখা পেয়েছিলাম বটে, কিন্তু ভাল রকম সাক্ষাৎটা হয়নি। আমার এরকম মনে হয়, সময়কে কোনো একটা অবস্থাতে দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাকে জানতে পারা যায় না। দেখা আর জানাতে পার্থক্য আছে।

সময় ব'লে একটা বস্তু আছে সে-কথা আমি জানি। সে-কথাটা আমি বুঝতেও পারি। কিন্তু এটার দ্বারা এই বোঝায় না যে সময় বস্তুটাকে আমি ঠিকমত দেখতে পেয়েছি অথবা জানতে পেরেছি। হয়তো বা এরকমই— আমি যতটা সময়কে জানি তারচেয়ে বেশী জানাই যায় না। আমি সময়কে দেখি ঠিক যেন নদীতীরে দাঁড়িয়ে নদীকে দেখি। সময়টাকে যে দেখতে পাচ্ছি এই চেতনাও তো সহজে আসে না। যার আসে তাঁর আসে।

সময়ের সম্বন্ধে এই যে কথা বলছি এই কথাও যেন এক আশ্চর্য কথা। সময় কি? কবের থেকে সময় গতিলাভ করেছে অর্থাৎ কবের থেকে সময় চলেছে? সময় বস্তুটা কী ভাবে বর্তমান? সময় আছে কোন্ সে ধাঁচে? সময় তো কোনো একটা জিনিস না। সময়কে কে কবে দেখতে পেয়েছে। সময়কে দেখতে হ'লেও তো সময়ের সাহায্য নিয়েই দেখতে হবে। এইসকল কথাই তো সময়ের সম্পর্কে জানবার মত কথা। সময়কে নিয়ে আমি শুধু চিন্তা করছি তা নয়। সময়কে নিয়ে আমি চিন্তায় প'ড়ে গেছি—এরকম বলাই ভাল।

শুধু আজ নয়, সময়কে নিয়ে কত-যে বিচিত্র ধরনে কত রকম চিন্তা আমার জীবনে এসেছে বা এসে থাকে সেও আমার এই জীবনে একটা বড় রকমের ব্যাপার।

ধর, আমি সময়কে লক্ষ্য করছি। সময়কে লক্ষ্য করা আমার পক্ষে সাংঘাতিক একটা কিছু নয়। সাধারণ একটা ব্যাপার। সময় যেন আমার নিত্যকালের এক সঙ্গী। আমি সময়ের কোলেতেই বাস করি। সময়ের কাছে কাছেই আমাকে থাকতে হয়। সময়ের অন্তরেই সব কিছু থাকে, আমিও থাকি। সময়ের সঙ্গে আমার যে এই সম্পর্ক সেও এক নিগূঢ় সম্পর্ক।

'কাল' বস্তুটাই আমার মা। কালের কোলে আমি মানুষ। কালীর আনন্দের মধ্যেই আমি বিরাজমান। কালের আনন্দটাই যে কালী। একটি আশ্চর্য আনন্দে কাল আপনাতে আপনি স্পন্দিত। সেইখানেই সে কালী। তখন আর সে কাল নয়। তখন সে কালী। তখন আমি মায়ের বুকে রয়েছি। রয়েছি আনন্দেতেই মগ্ন। সেই আনন্দ আমার আমাকে জাগিয়ে রেখেছে এবং বাঁচিয়ে রেখেছে। তাই সহজ স্বাচ্ছন্দ্যে এই কথা বলা চলে, আমি আমার মায়ের বক্ষে বিধৃত।

এই তো আমার মা রয়েছেন। সেই মাতা জগন্মাতা কালী স্বয়ম্। মায়ের বৈচিত্র্যছটা বিশ্বে বিচ্ছুরিত। আমিও মায়ের আলোয় আলোকিত।

আমার যা কিছু সমস্তই মা নিজে হয়েছেন। মা ছাড়া আমি নই। মা ছাড়া কেউ কোথাও নেই। মা কে? আর কি নাম আছে জানি না। আমি এ স্থলে মাকে কালী ব'লে অভিহিত করলাম। প্রসঙ্গটা চলছিল কালের। সেই কারণেই সময়ের কথা আমি পেড়েছি। সময় অথবা কাল তার তরঙ্গরাজি নিয়ে চ'লেছে। চ'লেছে তো চ'লেইছে। চঞ্চল ছন্দে আপন অন্তরে অদ্ভুত আনন্দে সে গতিশীল।

যা কিছু সব কিছু এই কালের তরঙ্গে তরঙ্গায়িত। কী যে তার থেকে বাদ যাবে সে-কথা আমি বলতে পারব না। সকল কিছুই—হয়তো সকল কিছুই তার ছন্দে ছন্দোময়, তার রঙ্গভঙ্গে চঞ্চল। সমস্তটা মিলে যেন একটি অতি অদ্ভুত গতিশীলতা।

অপরূপ তার নাচ। পায়ের তালে তালে সে একেবারে চঞ্চল। তার অস্তিত্বটাই তার নাচে নাচে রূপ নিয়েছে। আশ্চর্য সেই নৃত্যপরায়ণা জননী কালীকে প্রণাম ক'রে এবং সম্বর্ধনা জানিয়ে আমি আমার প্রসঙ্গ টেনে নিয়ে চলি।

আবার সেই সময়ের কথা। অতীতকাল এবং ভবিষ্যৎকাল। মধ্যে রয়েছে বর্তমান কাল। একটু লক্ষ্য কর। একটু বোঝবার চেষ্টা কর। যা-কিছু বুঝে বুঝে চলেছ সেই সব কথা কিছুকালের জন্য একপাশে প'ড়ে থাক্। এসো আমরা আমাদের সেই মায়ের অপরূপ নৃত্যকে স্মরণ করি। এবং সেই অপরূপ নৃত্যকে দেখতে দেখতে পথে অগ্রসর হই।

আমরা আমাদের মায়ের আশ্চর্য লীলার দিকে তাকিয়ে আছি। না, আমরা কোনো আলংকারিক ভাষা ব্যবহার করব না। কোনো একটি রকমের দ্বারা মাকে নির্দিষ্ট করবার প্রয়াস পাব না। মায়ের স্বরূপের দিকে যখন তাকাই, তখন দেখতে পাই, মা আমার কোনো দিকেই কোনো ক্রমে কোনো ভাবে কোনোরকম নির্দেশে নির্দিষ্ট নহেন। সেই বনের পাখি কোনো খাঁচাতেই ধরা পড়ে না। বনের পাখি বনেতেই ভাল শোভা পায়। বনের পাখি যখন মাত্র একটি রকমের ভিতর দিয়ে মনের পাখি হয়ে দাঁড়ায়, তখনই

তার বন্ধন দশা।

কোনো বাঁধনেই তাকে বাঁধা যায় না এটা ঠিক। তবু আমরা আমাদের মাকে যেন আয়ত্ত না ক'রে থাকতে পারি না। মাকে আবার আয়ত্ত করব কি? মা নিজেই আমাদের আয়ত্ত ক'রে রেখেছেন। আমরা চিরকালই মায়ের হাতে ধরা প'ড়ে গেছি এবং ধরা প'ড়ে আছি। আমাদের চোদ্দ পুরুষের সাধ্য নেই মাকে আয়ত্ত করে। মা কোনোদিন কখনও কোনোভাবেই কারোর দ্বারা আয়ত্তীকৃত হ'তে পারেন না। স্বেচ্ছায় তিনি সব কিছু করেন। কিন্তু আমার তোমার ইচ্ছাতে তাঁকে যদি বাঁধতে চাই সেটা হবে আমাদের পক্ষে নিতান্ত ছেলেমানুষি।

কালকে নিয়ে আমরা চলেছি। কালের মধ্যেই আমরা আছি। কালেতেই আমাদের জীবনযাপন। কালকে নিয়ে আমরা-যে কথা বলতে চাই সেটা আমাদের পক্ষে কিছুই আশ্চর্য নয়। যে-বস্তু আমাদের জীবনী-শক্তি তার কথা তো আমরা বলবই। তার দিকে তো আমরা চলবই। তাকে নিয়ে আমরা তো থাকবই। আর পাঁচটা জিনিস নিয়ে থাকা তো আমাদের পক্ষে বিড়ম্বনা। কালের কথাই আমাদের ঘরের কথা। কালকে বাদ দিয়ে অন্য কথা আমাদের পক্ষে বাইরের কথা।

আচ্ছা, এসো আমরা কালকে নিয়ে একটুখানি চিন্তা করি। যে কালটা চ'লে গেল সে কাল তো সর্বপ্রকারেই গত। কোনোভাবেই আমরা তাকে আমাদের ধরা ছোঁওয়ার মধ্যে আনতে পারব না। তীর হাতের থেকে বেরিয়ে গেছে। সেই তীরের উপর আর কোনো কর্তৃত্ব নেই। যেটা গত সেটা একেবারেই গত। সম্পূর্ণভাবেই গত।

তারপরে অপর দুটি দিকের কথা দেখছি। ভবিষ্যৎ কাল ব'লে একটা কাল আছে। সেই কাল না থেকেও বর্তমান। সেই কালের নাগাল আমরা পাই না। তবু আমাদের চিন্তার জগতে, ভাব এবং ভাবনার জগতে সেটাকে যেন কল্পনা করতে পারি। সেইখানে সে রয়েছে বৈকি। তবে সে রয়েছে তার নিজের ক্ষেত্রে। তার বাইরে সে নেই। তাই সে না থেকেও আছে।

থেকেও নেই বটে, কিন্তু না থেকেও আছে। এই হিসেবে বলতে গেলে বলতে হয়, তার থাকাটা এক আশ্চর্য বস্তু।

ভবিষ্যৎকাল আছে তো বটেই, কিন্তু কেমনভাবে আছে—কোন্ সে রকমে সে কথা বলা যায় না। বলা যায় না ব'লে কেউ বলতে পারে না।

তবু তার অন্তহীন অস্তিত্ব কেউ নাকচ ক'রে দিতে পারে না। ভবিষ্যৎ-কাল নেই এমন নয়। এমন হয় না—হ'তে পারে না। ভবিষ্যৎকাল ব'লে জিনিসটা অবশ্য আছে। আমি অথবা কেউ যদি নিঃশেষে শেষ হয়ে যাই তবু সে আছে। কল্পনা ক'রে বলছি। যদির ওপর দাঁড়িয়ে কথাটা বললাম কিন্তু। ভবিষ্যৎকাল বস্তুটা তার আশ্চর্য আসনে সমাসীন। কেউ তাকে জানতে পারে না, জানতে পারবেও না।

কালের দুটো দিকের কথা বললাম। সামান্য একটু স্পর্শ ক'রে কথাটাকে বলবার চেষ্টা রাখলাম। এখন এখানে বাকী রইল বর্তমান কাল। অতীতকেও পাওয়া যাবে না এবং ভবিষ্যৎকেও ধরা যায় না। এ স্থলে বর্তমানটা কোথায়। বর্তমানটা আছে এবং নাই-এর সীমার বাহিরে বর্তমান। বর্তমানটা কোথাও নেই। অথচ বর্তমান কালের আলোতেই সব কিছু সকলে দেখতে পায়।

বর্তমান কালই জোর। সেই জোরেই আমাদের সকল জোর। বর্তমানকালের শক্তিতেই আমাদের সকল কিছু শক্তি। বর্তমান কালটাই তো বস্তু। আমার সেই কথাটা মনে প'ড়ে গেল। রামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন, ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু।

প্রত্যেক রকমের কালই আশ্চর্য। কিন্তু বর্তমান কাল আরও আশ্চর্য। অনেক অনেক আশ্চর্য বস্তুর মধ্যে এ এক চরম আশ্চর্য।

কী বললে যে ঠিক বলা হয় সে কথা ভেবে পাই না। ঠিক হয়তো কিছুতেই ঠিকমত ভাষাতে আসে না।

পরিচ্ছেদ — ৩৮

এবার আমার গল্পেতে আসি। এ গল্প কিন্তু সত্য গল্প। আমরা আমাদেরকে ভট্টাচার্য ব'লে থাকি। অর্থাৎ আমরা ভট্‌চায্যি বামুন। বাবা যদিও বর্তমান কালের গ্রাজুয়েট ছিলেন তবু বাবা থাকতেন ভট্‌চায্যি বামুনের মতই। বৈদিক ব্রাহ্মণেরা যেমনভাবে থাকেন তেমনই। সাহেবিয়ানা একেবারেই ছিল না। যজমান বাড়ীতে পুজোআর্চা নিয়ে থাকা — এইসব চলত আর কি। অন্য পাঁচটা বামুন যেমন হয় অনেকটা তেমন। তবে ওর মধ্যে বাবা জানতেন ইংরাজী লেখাপড়া। বেশ ভাল রকমই জানতেন এ কথা বলা যায়। আমাদের আশপাশে দু চার জন এমন মানুষ ছিলেন যাঁরা বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বটে, কিন্তু কোনো না কোনো কলেজের অধ্যাপক অথবা উচ্চ শ্রেণীর লেখক। অথবা কেউ কবি।

যেমন সুকান্ত ভট্টাচার্য ছিলেন একজন বিপ্লবী নেতা। বিপ্লবী নেতা না ব'লে বলছি বিপ্লবী পুরুষ। আমার তিনি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। তাঁর পিতা অথবা জেঠামশায় আমারও জেঠামশায়। তবে তাঁরা সবাই ছিলেন নিতান্ত গরীব। তাঁদের প্রতিষ্ঠিত দুটি লাইব্রেরী এখনও দেদীপ্যমান। হরিহর লাইব্রেরী এবং সারস্বত লাইব্রেরী। তাঁরা মধ্যবিত্ত বাঙালী — এইটা বললেই বরং ঠিক বলা হয়। সুকান্তর জেঠামশায় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ — যাঁকে আমরা সাতু জেঠা ব'লে ডাকতুম একজন প্রখ্যাত পুরুষ। তাঁদের বেলেঘাটার বাড়ীতে আমাদের যাতায়াত ছিল।

কিন্তু কথা এই, তিন চার পুরুষ আগে আমরা ছিলাম চক্রবর্তী এই রকম শুনেছি। যতদূর মনে হয় আমরা যখন কলকাতার দিকে চ'লে এলাম, আমরা তখন হয়ে গেলাম ভট্টাচার্য। আমার ঠাকুরদাদাকে অনেকে পণ্ডিতমশায় ব'লে জানতেন।

আমার এক দিদির স্বামীর কথা এইখানে পাড়ি। আমার পিসতুতো বোন কম্‌লী অথবা কমলার স্বামী। তাঁর দেশ ছিল বরিশাল জেলায় অথবা

কাছাকাছি। সেখানকার যুবক তিনি। কলকাতার বিদ্যাসাগর কলেজে তিনি পড়তেন বি. এ. ক্লাসে। বিদ্যাসাগর হোস্টেলেই থাকতেন। একদিন এসে বললেন — আমাদের হোস্টেলে সরস্বতী পূজার বিশেষ আয়োজন। আমাকে বিশেষ ক'রে বললেন, তাঁর সঙ্গে তাঁর হোস্টেলে গিয়ে উৎসবে যোগদান করি এবং আনন্দ করি। আমার ঠিক মনে নেই, আমার গান করবার ক্ষমতাটাই ছিল উপলক্ষ্য হয়তো বা।

নাম তাঁর ছিল শিবু। শিবদাস ভট্টাচার্য বা এরকম একটা কিছু। বাড়ী তাঁর ছিল ভোলা নামক একটা জায়গায়। মাঝে মাঝে তিনি এসে উদয় হ'তেন। আমাদের বাড়ীতে ছেলেমহলে বা মেয়েমহলে তিনি জোরদার আসর জমাতেন। পরে একটা সময়ে তাঁর ব্যারাকপুরের বাড়ীতে গিয়ে আমরা কয়েকটা দিন ছিলাম। আমি আর আমার ভাই। কম্‌লীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়—যে কমলীর কাছে আমি আমার শিশুকালে শুয়ে ঘুমোতাম প্রায়ই।

আর একটি কথা এখানে উল্লেখ না করলেও পারতুম। তবুও করছি। ইনি অর্থাৎ শিবদাস একদিন চুপিসারে মুরগীর ডিমের কি যেন একটা নিয়ে এসেছেন। আমাদের বাড়ীতে তখন রামপাখীর কোনোক্রমেই প্রবেশের অনুমতি ছিল না। অসম্ভব। সেই ভদ্রলোক নিয়ে এসে চুপিচুপি আমাদের বোনেদের ভিতরে দান খয়রাত করলেন, অর্থাৎ কি না অভিনব জিনিস এনেছি তোমরা খাও। হয়তো বা ঠাকুমা পিসিমা কাকীমা এঁরাও জানতেন না। ছাদের উপরেই ভাগ বাটোয়ারা হ'ল এবং আমরা সবাই মিলে প্রসাদ পেলাম। কোন্ ঠাকুরের প্রসাদ সে কথা এখন আর বলতে পারব না। তবে পাখীটাকে যে লোকে রামপাখী বলত সেই কথা কানাঘুষোয় শুনে আসছি। পাখীটা যাই হ'ক, তার সঙ্গে রাম আছে এটাই আমার চোদ্দ-পুরুষের ভাগ্য। যেখানে যত চাপাচাপি এবং ঢাকাঢাকি সেখানে তত উল্টো বুঝলি ফল।

এখন ভাবি আর হাসি। বর্তমানে বহুকাল ধ'রে আমি মাছ, মাংস,

ডিম ইত্যাদি খাই না। বহুকাল মানে অন্ততঃ পঞ্চাশ বছর। যখনকার কথা বলছি, তখন কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক এখনকার মত না। আমাদের বাড়ীতে কোনোকালেই পেঁয়াজ এবং রসুনের প্রচলন দেখিনি। যা কিছু তা হ'লেও ছিটে এবং ফোঁটা, এর বেশী নয়।

বলতে বলতে এবং লিখতে লিখতে আমার মনে প'ড়ে যায় আর একটি কথা। যোগীন্দ্রনাথ সরকারের লেখা হাসিখুশি নামক বইতে একটা কথা— কবিতা — ধন ধন ধন / বাড়িতে ফুলের বন / এ ধন যার ঘরে নাই তার কিসের জীবন, / তারা কিসের গরব করে / তারা আগুনে পুড়ে কেন না মরে।

কবিতার কলি খুবই সুন্দর, খুবই চমৎকার। এতে আমার কোনো সন্দেহ নেই। আর সন্দেহ করলেই বা শুনছে কে? এ কথা আজ সর্বজনবিদিত যে, হাসিখুশি ছেলেমেয়েদের বই সর্বকালের এবং সকল রকমে।

কিন্তু মনে একটা খট্‌কা লাগে। খট্‌কা জিনিসটা আমার মনের মধ্যে খট্ খট্ ক'রে এতই আওয়াজ তুলল যে, আমি চঞ্চল না হয়ে পারলাম না। এখানে আমার মা অনন্তাকে শেষকালে ব'লেই ফেললাম — একি! এ কি রকম কথা! এত ভাল বই। তাতে একি প্রকারের উক্তি। যাদের ঘরে বাচ্চা নেই তারা 'আগুনে পুড়ে কেন না মরে?' তারা কি এতই অপরাধী! জীবনে তাদের এতই অপরাধ জমা হয়েছে যে, তাদের আত্মহত্যা করা উচিত গায়ে কেরোসিন তেল ঢেলে এবং আগুন জ্বেলে?

অনন্তা মা আমার কথাগুলো খুব মন দিয়ে শুনলে। বললে, তাই তো, আমি আগে এ কথাটা তো ভাবি নি। তুমি ধরিয়ে দিলে তাই বুঝতে পারছি। সত্যি কথাই তো। আগুনে পুড়ে মরবার কি হয়েছে?

মানুষের মনের দিকে তাকাই। আপনার অন্তরের দিকেও তাকাই। আমি তো পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, নিতান্ত সাধারণ মানুষের মানসিক জগতের একটা অতি সাধারণ ভাব। যে ভাব থাকা উচিত নয় এমন একটা ভাব।

মানুষ মানুষকে চায়। প্রত্যেক মানুষই চায় তার সন্তানাদি হোক। পত্রে পুষ্পে পাতায় পল্লবে গাছটা সুশোভিত হোক, এ কে না চায়? কেউ তো ভাবে না—এক থেকে দশ পর্যন্ত এগুতে গেলেও বাড়তে বাড়তে সংখ্যাটা কোথায় গিয়ে যে ঠেকবে তার ঠিকানা নাই। তারপরে এগোতে এগোতে শেষকালে আমরা সবাই অথৈ জলে। ছেলেবেলায় যেন শুনতুম এই পৃথিবীর লোকসংখ্যা তিনশ কোটির মতন। এখন শুনতে পাই—এই ক' বছরেই কানে আসে পৃথিবীর লোকসংখ্যা প্রায় এক হাজার কোটির কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে জনসংখ্যা না বাড়ে এই বিষয়ে অনেকেই ভাবতে শুরু করেছেন। আমি তো মফস্বলে ঘুরি, অনেক জায়গাতেই পোস্টার চোখে পড়ে—সন্তান সংখ্যা যেন বৃদ্ধির দিকে না যায়—এই সাবধান বাণী।

লোকের সংখ্যা একই তালে বেড়ে চললে আমাদের খুব একটা সুবিধে হবে না, বরং আমরা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ব- এ কথা তো অত্যন্ত একটা সাধারণ কথা। এ কথা বুঝতে কোনোরকম পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন হয় না। Common sense থেকেই বোঝা যায়।

মনের মধ্যে হতাশা আসে। মনের মধ্যে কালো মেঘ এসে জমতে আরম্ভ করে। চারিদিকে মিথ্যা এবং অন্যায়ের কী প্রবল প্রতাপ! এই ঘটনা আমাকে বুঝি পাগল ক'রে দেবে।

কিছুই হয়নি। জগৎটা তো সুন্দর গতিতে চলেছে। আমরা সেখানে নিজেদের অন্তরের চাপে চাপ সৃষ্টি করি। ময়লা নেই তবু এসে পড়ে যত রাজ্যের ময়লা মাটি। গাছ থেকে কালো ধোঁয়া বের হয় না, নির্মল আকাশে অসুন্দর কিছুই নেই। তবু এর মধ্যেই আমরা সৃষ্টি করি ধুলির জাল এবং ধোঁয়ার কুহক। কিছু নেই তবুও আছে।

মানুষের মনে কিছু ছিল না। তেমন কিছুই ছিল না। যা ছিল শুধু তাই ছিল। যা চিরকাল আছে সেই দিয়েই মাত্র মণ্ডিত ছিল মানুষের মন। আমরা সেখানে নিজেদের বহ্বাড়ম্বরে জাঁকিয়ে বসি। একটা কিছু তো ফলিয়ে তুলতে হবে। পাণ্ডিত্য ফলাবার জায়গা কোথায় সে যেন খুঁজে

পাচ্ছি না। মনের ভিতরে একটা urge বেড়ে এবং বাড়িয়ে যেন ক্ষতি-পূরণ করতে আমরা বদ্ধ পরিকর। ক্ষতির তো পূরণ হয়ই না বরঞ্চ হয় ক্ষতির পরে ক্ষতি। একটা দিক দিয়ে বিজ্ঞানের সম্মতিক্রমে আমরা অবাধ অগ্রগতি লাভ করি। করি নয়, করছি। সব সুন্দর, সব সুন্দর। আমরাই তার মধ্যে কুৎসিৎ কালো ময়লা লেপন করতে পশ্চাৎপদ হই না। সৌন্দর্য, মাধুর্য এবং চাতুর্য যেন আমাদের সহ্যই হ'তে চায় না।

কত কথাই মনে পড়ে। গয়ার কথাটাও একটা মস্ত বড় কথা। গয়া স্থানটি পৃথিবীর উপরে এমন একটি ক্ষেত্রে অবস্থিত যেখানে চরম গরম এবং অত্যন্ত ঠাণ্ডা। কলকাতা থেকে কাশীর পথে গয়া পড়ে। যতদূর জানি বিষুব রেখার কাছাকাছি এই গয়া। তাই সেখানে যেমন গরম তেমন ঠাণ্ডা।

বিষ্ণুপাদপদ্মের কথা বলছি। আমি গিয়ে দেখে এসেছি সেই স্থান। আকাশগঙ্গা পাহাড়ও দেখে এসেছি। সুন্দর বনজঙ্গল অনেক চোখে পড়েছে ওখানে। সত্য সত্যই গয়া একটি অপরূপ স্থান, অন্তত সাধনভজনের দিক দিয়ে। কিন্তু এই স্থানকে কলঙ্কিত করেছি আমরা। আপন মনের মাধুরি মিশায়ে নয়। আপন মনের ময়লা মিশায়ে আমরা তৈরি করেছি আমাদেরই মনের একটি মানচিত্র।

পাণ্ডাদের অত্যাচারের কথা এখানে বলছি না। সে তো শুনে শুনে কান আমাদের পচে গিয়েছে। যেখানে যত ভাল তীর্থছবি, সেখানে নানা-বিধ পোকামাকড়ের তত বেশী আক্রমণ। গয়ার দফা একেবারে গয়া। হায় ক্যা হো গয়া। প্রকৃত কথা এই, আমার মনের খেদ আমি চাপতে পারছি না। এই কিছুকাল আগেও দরিদ্র বিধবাদের একটা দলকে একটা ঘরে আটকে রেখে তাদের কাছ থেকে পয়সা সংগ্রহের যে কাহিনী আমি শুনেছি তাতে আমি হতবাক।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের একটি বড় রকমের কেন্দ্র ওখানে আছে, এ আমরা সবাই জানি। অন্যায় নিবারণের একটি চেষ্টা। মনে পড়ল

রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতা—'অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে / তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে।'

সেই ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সাইন বোর্ডে উল্লিখিত নামটির মত ঠিক আর একটি নাম রেখে কে বা কারা যেন আর একটি সংস্থা স্থাপিত ক'রে ফেললে। ট্রেন থেকে লোক নামা মাত্র তাকে বা তাদের নিয়ে যাওয়া হয় সেই নূতন আশ্রমটিতে। ভারত সেবাশ্রম নয়, ঠিক ওই রকম ধরনের নামের আর একটি আশ্রম। তারপরে কি ঘটে আমার আর বলবার দরকার নেই। আমি শুধু এখানে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রবর্তক স্বামী প্রণবানন্দজীকে অন্তরের প্রণাম জানিয়ে আমাদের গল্প নিয়ে অগ্রসর হই। গল্প হ'লেও সত্যি সব কথা।

আরও মনে পড়ে। মনে পড়ে আর বুক যেন ভেঙে যায়। গীতা-গ্রন্থে কৃষ্ণ নামক অদ্ভুত পুরুষ সেই যে বলেছিলেন—

সর্বতঃ পাণিপাদং সর্বতোঽক্ষি শিরোমুখম্।
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥

ইচ্ছা হয় লোকের দরজায় দরজায় গিয়ে বলি, বিষ্ণুর পাদপদ্ম কি কেবল গয়াতেই ? বিষ্ণু মানে তিনি যিনি সর্বব্যাপী। গীতার শ্লোকের সঙ্গে মিলিয়ে নাও না। ব্যাপ্নোতি ইতি বিষ্ণুঃ। যিনি পরিব্যাপ্ত, তিনিই বিষ্ণু। যিনি সকল জায়গায় সব ক্ষণ তাঁকেই বলা হয় বিষ্ণু। তিনিই তো পরম দেবতা। তাঁকে যারা ভজনা করে তারাই প্রকৃত বৈষ্ণব। প্রকৃত বৈষ্ণব শুধু ভারতে নয়, অনেক দেশেই রয়েছে। মুসলমানদের মধ্যেও আছেন, খৃষ্টানদের মধ্যে নেই তা নয়। তবে এই দেশে এই ভাবের সাধনা বেশি। ভারতে বিষ্ণুর সাধনা বহু পরিবারে প্রচলিত আছে। বৈষ্ণব হ'তে পারলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করতাম। সেই বিষ্ণুপাদপদ্মের ছাপ অথবা ছবি কোথায় আছে অথবা কোথায় নেই। যার চক্ষু আছে সেই দেখুক। সর্বত্র বিষ্ণু, সর্বত্রই বিষ্ণু।

এই বোধেই জাগ্রত হয়ে উঠতে হবে। এই চেতনাতেই উত্তরণ।

জীবনে আমাদের লাভ করবার মত একটা বস্তু। এইখানেই যেতে হবে। অন্য কোথাও নয়। বিষ্ণুর চরণ-চিহ্ন যে চেতনার মধ্যে ছাপ রেখে গিয়েছে, সেই চেতনাতেই তো আমরা জেগে উঠব। সম্বল আমাদের ঐকান্তিকতা এবং আন্তরিকতা।

আমি বলি—নিজের বুকে হাত দিয়ে বলি, যার এখানে নেই তার কুত্রাপি নেই। এখানে যার আছে, তার সর্বত্রই আছে। বুকে হাত দিয়ে দেখাই বটে, কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক বক্ষদেশে নয়। যেখানে সাধারণ লোক হৃদয় ব'লে থাকে, সেখান থেকে শুরু ক'রে মস্তিষ্কের কেন্দ্র পর্যন্ত সর্বত্রই হৃদয়। হৃদয় আর হৃদয়। ঊর্ধ্ব চেতনাই প্রকৃত হৃদয়। কোনো কোনো লোকে সেই দিককেই লক্ষ্য ক'রে ব'লে থাকে দহরাকাশ। হৃ, র, দ এই তিনটে শব্দই বিপরীত ক্রমে দহরে পরিণত হয়েছে—এ কথা বলা বাহুল্য।

আমি কিন্তু অরূপ এবং সরূপ এই দুই রূপই মেনে থাকি। আমাদের ভজন গানেও এই দুটির উল্লেখ আছে। সাকারও মানি, আবার নিরাকারও সম্পূর্ণ-ই মানি। সাকারে আমার কোনো অসুবিধা নেই। সাকার পূজা অথবা সাকার উপাসনা মানুষের অন্তরে বোধের সঙ্গে নিত্য সংজড়িত। আকার নিয়েই তো যত কাণ্ড। আকারকে বাদ দিয়ে যিনি আছেন, তিনি পূর্ণ বস্তুরই একটি অংশমাত্র। আকারে আকারে সকল আকার বিচিত্র হয়ে উঠেছে। তাই আমার কাছে আকার যেমন আছে, মূলে সর্বাকার তেমনই আছে। আবার আছে নির্নাস্তি নিরাকার। যত রকম idea হ'তে পারে অথবা conception হ'তে পারে, সমস্তই রয়েছে। নিজের নিজের জায়গায় সবই আছে। কিছুমাত্র কিছু বাদ নেই। সমস্তই রয়েছে। আমি বলি সমস্তই থাকুক। বাদ কিছু দিয়ে কাজ নেই। বাদ যে নেই এইটেই সংবাদ। আমাকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলতে হবে এবং ভাবতে হবে—শুধু আমাকে কেন সবাইকেই এই ভাবনা অবলম্বন করতে হবে :—এই যে তুমি, ওই যে তুমি, সেই যে তুমি। এখানে তুমি, ওখানে তুমি, সেখানে তুমি। এমন তুমি, অমন তুমি, তেমন তুমি। কোনো কিছুকেই আমি

ত্যাগ করতে পারব না। নরককেও না, অন্ধকারকেও না, কুৎসিতকেও না, ভুলভ্রান্তিকেও না। সকলকারই আছে একটি তাৎপর্য।

পরিচ্ছেদ — ৩৯

আমার জীবনের পথে মৌনীমা এসে প'ড়েছিলেন। শুধু এসে প'ড়েছিলেন নয়, বিশেষভাবেই এসে আমার জীবনটাকে ধ'রে নাড়াচাড়া দিয়ে গেছেন। কয়েকটা বছর—মনে নেই ক'টা বছর হবে—মৌনীমা আমার জীবনে পদার্পণ করেছিলেন। তাঁর সেই পদার্পণ শুভ পদার্পণই বটে। তাঁর পায়ের ছোঁয়াতে আমরা জীবনখানা যেন রঙে রেঙে গিয়েছিল।

মৌনীমা হয়ে উঠেছিলেন আমার জীবনের মধ্যমণি যেন। আমি অন্তরে অন্তরে মৌনীমায়ের প্রতি আশ্চর্য একটা আকর্ষণ অনুভব করতাম। মৌনীমায়ের একখানি ছবি আমার কাছে বাক্সের মধ্যে রেখে দিয়েছিলাম। কয়েকজন মহাত্মার ছবি ছিল। মৌনীমা তাঁরই মধ্যে একজন।

একবারকার কথা বলি। রায়পুর দেরাদুনে আছি। রায়পুর গ্রামে ছোট্ট একটা পাহাড়ের উপর আমরা রয়েছি জমিয়ে এবং জাঁকিয়ে। তখন আমাদের সমস্ত ভ্রমণই শ্রীশ্রীমাতা আনন্দময়ীকে কেন্দ্র ক'রে। মার যাওয়াকে উপলক্ষ্য ক'রে আমরা নানা জায়গায় যেতুম। মায়ের কাছে অত্যধিক আদর পাওয়ার দরুণ মাকে আর ছাড়তে চাইতুম না।

রায়পুরে আছি। মৌনীমা যাবেন হরিদ্বারে তখনকার কন্যাপীঠে। কন্যাপীঠ মাতা আনন্দময়ীর একটি সংস্থা। মেয়েদের সংস্থা। অনেক ভাঙ্গা গড়ার ভিতর দিয়ে কন্যাপীঠ এখন সুন্দর হয়ে উঠেছে।

হরিদ্বারে যাচ্ছেন মৌনীমা। আমিও যাচ্ছি হরিদ্বারে। মৌনীমার সঙ্গেই যাচ্ছি তা নয়। সঙ্গেও বটে, আলাদাও বটে। গাড়ীর একটা

কামরায় মৌনী মাতা চ'লে গেলেন। আমিও সেই গাড়ীরই অন্য একটা কামরায় উঠে মৌনী মায়ের সঙ্গেই চ'লে গেলাম। কন্যাপীঠের বাড়ীতে মৌনী মা গিয়ে উঠেছেন। আমিও গিয়ে উঠেছি।

অভয় এসেছে। মায়ের প্রিয় বালক এসে উঠেছে। হয়তো অসুবিধা। হয়তো কেন নিশ্চয় অসুবিধা। ও তো ছেলে। ও এসে উঠল কেন। ওর তো আসবার দরকার ছিল না। কিন্তু কে শোনে কার কথা।

অভয়—অর্থাৎ আমি কেন যে সেখানে গিয়েছি—কোথায় কি করেছি সব কথা নিজেই ভাল জানি না। শুধু মনে পড়ে, মৌনী মাকে ছেড়ে আমি যেন থাকতে পারতুম না।

বিকেলবেলাতে পৌঁছে গেলাম হরিদ্বারে। কিছু সংখ্যক মেয়ে আশ্রমে আছে। সেই বাড়ীতে মৌনী মাও গিয়ে পড়েছেন, আমিও গিয়ে উঠেছি। মনে রাখতে হবে, মৌনী মাতা একজন গৈরিকধারিণী সন্ন্যাসীনী। অথবা এক সাধু মা। বয়সে মৌনী মা আমার থেকে অনেক অনেক বছরের বড়। বিরাট ব্যবধান। যেখানে গিয়ে পড়েছি, সেখানে অনেক মেয়ে আছেন। অনেক বয়সের অনেক মেয়ে। আমার কিন্তু মৌনী মা ব্যতীত অন্য কারোর দিকে কিছু মাত্র লক্ষ্য নেই। আমার লক্ষ্য শুধু মৌনী মা।

একটা সূক্ষ্ম কথা বলি। মূলে আমার লক্ষ্য ভগবান। যেহেতু মৌনী মা ভগবানের পথের পথিক, যেহেতু মৌনী মা ভগবানকেই জীবনের সার করেছেন, সেই হেতু আমার মন এবং প্রাণ—আমার সমস্তটা অন্তর মৌনীমাকে আশ্রয় করেছিল। তখনকার মত আমি অন্য কিছুই বুঝিনি।

এখন তো আমার জীবনে আমার কাছে অনেক অনেক কিছু এসে জমা হয়েছে। তখন কিছুই ছিল না। এমন কি কাপড় চোপড়, পোষাক-আশাক সমস্তই নিতান্তই সাধারণ অর্থাৎ খেলো বস্তু।

আমি যেন ঝড়ে উড়ছি। আমি যেন গাঙে ভাসছি। আমি যেন স্রোতের টানে চলেছি। তখনকার মত মৌনী মা যেন আমার জীবনের কেন্দ্রস্থলে।

কিন্তু এখন পরিষ্কার বুঝতে পারি, আমার মর্মের কেন্দ্রস্থলে একজন মাত্র একজন। চিরকালই একজন। আশ্চর্য একজন। সেখানে দু জনের কোনো স্থান নেই। সেখানে দ্বিতীয়ের কোনো ব্যাপারই নেই।

ওই যে গীতার মঙ্গলাচরণে আছে অদ্বৈত রূপ অমৃতের কথা—সেই কথা মনে প'ড়ে যায়। অদ্বৈতই অমৃত। এই জগতে সব মৃত, অমৃত কেবল অদ্বৈত তত্ত্ব। বিশ্বের তাবৎ পদার্থ মরণধর্মী। সমস্তই মৃত্যুর দ্বারা আচ্ছন্ন। যেখানে দুই নেই, শুধু এক সেইখানেই অমৃত নিহিত। আমাদের গানের মধ্যে আমরা গাই, একজন শুধু একজন।

যিনি একমাত্র তাঁকে এখানে জন বলছি। জন বললে অথবা আমাদের মত একজন মানুষ ভাবলে আমাদের প্রাণে একটা কিরকম যেন আনন্দ উপস্থিত হয়। যাঁকে চাইছি তিনি তাহ'লে আমাদের মতই একজন মানুষ।

তিনি বড় হ'তে পারেন, বড়র বড় তস্য বড় হ'তেও তাঁর বাধা নেই। তাঁর যে কোনোটাতেই বাধা নেই। অসুবিধা তাঁর কোনোখানেই নেই। তাঁর গতির কথা যদি বলি, সর্ব বিষয়েই তিনি অগ্রসর। তাঁর গতির নাম অগ্রগতি।

তিনি যে জ্বলতেই থাকেন। তাই তিনি অনির্বাণ। তাঁর ধর্ম হওয়া, করা এবং এগিয়ে যাওয়া। এই বিশ্বটাই তো হয়েছে, করেছে, এগিয়ে গিয়েছে এবং এগিয়ে চলেছে। চিরকালই এইরকম এগিয়ে চলবে। তাঁর কুলুজিতে এগিয়ে চলা ছাড়া পিছিয়ে পড়া নেই। আগে বঢ়ো—কেবলমাত্র আগে বঢ়ো। এই ধর্ম তাঁর একটা বিশেষ ধর্ম।

পরিচ্ছেদ — ৪০

এবার আমার জীবন-কথায় ফিরে যাই। জীবন-কথার একটা জায়গাতে এসে দেখতে পাই, আমি বাস করছি কলকাতার গোলপার্কের নিকটবর্তী একটি স্থানে। কাছেই কালির একটি কারখানা। বড় রকমের একটি কারখানা। দুই ভাই সেই কারখানাটি চালনা করেন। মহানামব্রত ব্রহ্মচারী মহারাজের তাঁরা কৃপাধন্য। কালির কারখানার চত্বরে মাঝে মাঝে খুব বড় সভা বসে। বহু লোক হরিকথা শুনতে সেখানে যায়।

আমি আমার তালে আছি। আমার তালেব মধ্যেই তো অনেক তাল রয়েছে। আমায় আবার কেউ কেউ ডাকেন আমি যাতে গীতার ব্যাখ্যা করি। অথবা গীতা পড়াই।

একজন মহিলা স্থির করলেন আমার গীতার ক্লাস হবে। ক্লাসে আমি গীতাগ্রন্থের ব্যাখ্যা করব নিয়মিত। অনেকে পড়তে আসবেন। সামান্য কিছু অর্থ মাস করা মাহিনা দেবে তারা।

সমস্ত প্রায় ঠিকঠাক। বড় মা ব'লে একজন আছেন। বয়স্থা মহিলা। বালীগঞ্জেই বাস। তিনি একখানা প্রচারপত্র অবধি ছাপিয়ে ফেললেন। এইরকম এইরকম একজন গীতা শিক্ষা দেবেন। অনেকেই এল। ক্লাসও মহাসমারোহে আরম্ভ হয়ে গেল।

কিন্তু বেশী দিন চলল না। অল্প দিন পরেই পরিসমাপ্তি। কেন বন্ধ ক'রে দিয়েছিলুম সে কথা এখন আর আমার মনে নেই। এটুকু মনে আছে গীতা-ক্লাসের প্রচারপত্রে লিখিত ছিল, গোপীনাথ কবিরাজের ছাত্র শ্রীঅভয়জী গীতা পড়াচ্ছেন।

আমার তো মহাদুশ্চিন্তা। গোপীনাথ বাবুর কাছে অনেক দিন অনেক অনেক কিছু শিক্ষা করেছি বটে কিন্তু তাতে আমাকে গোপীনাথজীর ছাত্র বলা যায় কি না। আমি ভাবলুম মিথ্যাচার হচ্ছে না তো। সেই ভেবেই আমার মস্ত দুর্ভাবনা জাগল।

এখন ভাবি, মিথ্যেচার কোথায়। গোপীবাবুর আমি ছাত্র ছিলাম তো নিশ্চয়। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের syllabus ধ'রে আমি কিছু পড়িনি সেখানে। নিছক জ্ঞান অর্জনের জন্য আমি তাঁর কাছে যেতাম।

গোপীবাবুর কাছে গিয়েছি। গোপীবাবুর বাড়ীতে থেকেছি। গোপীবাবুর ক্যামেরা নিয়েই আমার অজস্র ফটো তোলা। মোটের উপর আমার জীবনের একটা সময়ে গোপীবাবুই ছিলেন আমার কাছে যেন আদর্শ পুরুষ।

কিন্তু আমার আদর্শ তবু অন্য মানুষ। আমার আদর্শ কে? কি জানি কে? একজনের পিছে আমি দৌড়ে বেড়াচ্ছি। তাঁকে হয়তো চিনি, হয়তো চিনি না। চেনা না চেনা অন্য কথা। কিন্তু তাঁকে একদম জানি না সে কথা বলতে পারি না। তাঁকে জানি অবশ্যই জানি। কিন্তু তাঁকে বুঝে ফেলে ব'সে আছি সে কথা আসে না। তাঁকে বুঝিনি—হয়তো একেবারেই বুঝিনি। তবুও কেমন যেন কি ক'রে যেন তাঁর কথা জানতে পেরেছি। তাঁকে বুঝে ফেলেছি আমার মতন ক'রে। তাঁকে কিছুই আমি বুঝতে পারিনি। তবু আমি আমার মতন ক'রে বুঝে নিয়েছি।

যা বুঝেছি তাই। আমার কাছে এই বোঝাই পর্যাপ্ত। এর থেকে বেশী বোঝা হয়তো বা মনুষ্যদেহে হ'তে পারে না—হ'তেই পারে না।

অনেক রকম বোঝাবুঝি আছে। অন্তরের দিক দিয়ে, বাহিরের দিক দিয়ে, বেঁচে ব'র্তে থাকার দিক দিয়ে, সুন্দর ভাবে জীবন যাপনের দিক দিয়ে। আরও আরও শতেক রকমের দিক দিয়ে। এই সব রকমের বোঝা তো রয়েছেই।

আমি এগার দিন মগরাতে সীতারাম বাবার একটি উৎসবে কাটিয়েছিলাম। মনে পড়ছে আমি ঝুমরীতিলাইয়া নামক জনপদে ছিলাম তখন ললিত বিশ্বাস বাবার বাড়ীতে। এক দেড় মাস ওখানেই কেটে গেল। ওখানেও আমি আসন টাসন কিছু করতাম। ঝুমরীতিলাইয়া সুন্দর একটি জায়গা। অদূরেই পাহাড়। এক সাধু না কি ওখানে থাকেন। তখনকার কথা বলছি কিন্তু। সেই পাহাড়ে বেড়াতে গিয়েছিলুম একাধিক বার। বিহার অঞ্চলে এক সুন্দর জায়গা যে থাকতে পারে সেটা অনেকের চিন্তার বাইরে। শীতকালে তো খুবই ভাল। গরমকালেও দেখছি মন্দ লাগে না। পাহাড়ের উপরে বেড়াতেও গেছি দু একবার। গিয়ে সেই সাধুর সঙ্গে দেখা। ভারতের কত প্রান্তে কত যে এরকম সাধু রয়েছেন অনেকেরই তা জানা নেই। একমাত্র কুম্ভ মেলায় একটা হদিশ পাওয়া যায় বটে।

সে যা হোক, আমি আমার লটিপটি নিয়ে মগরাতে এসে হাজির হ'লাম। সীতারাম বাবার আস্তানায়। ধুম কীর্তন চলেছে। নাম— হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।

এ সব কীর্তন আমার ভালই লাগে। ভগবানের যে কোনো নাম যদি কীর্তন করা যায় আমার খুবই ভাল লাগে। এ বিষয়ে আর কি কথা আছে। শুধু সবিনয়ে অনুরোধ এই, নাম নিয়ে মারামারি ক'রে লাভ নেই। কী নাম, ক'টা অক্ষর, ওসব খবর আমি নিতে ভালবাসি না। ভগবানের যে কোনো নাম হ'লেই হ'ল। যে কোনো নাম, যে কোনো নাম। আমার ভগবানকে আমি আমার খুশি মত ডাকব। এ বিষয়ে কার কি বলবার আছে। চেঁচিয়ে ডাকলেই বা কি। যেমন আসে তেমন ডাকব। আমার ইচ্ছেমত আমি ডাকব। কারও কিছু বলবার নেই।

তবে একটা কথা। যে নামটি আমি জপ করছি সেই নামটি কারোকে

জানতে না দেওয়াই ভাল মনে করি। আমার কথা এখানে ঠিক বলছি না কিন্তু। আমি বলছি সকলকার কথাই। একটা ধ'রে কথা তো বলতেই হয়। আমি সেইরকম ভাবেই কথাটা বলছি।

আমি বলতে চাই, যার যে নাম ইচ্ছে সেই নামই কীর্তন ক'রে যাও। অথবা তুমি জপ ক'রে যাও। পারো নিরন্তর জপ করবে। অথবা যেমন ইচ্ছা জপ করবে। চলতে, ফিরতে, বসতে, শুতে, খেতে মনের মধ্যে রাখবে সেই নাম।

আবার বলি, একটি নাম বেছে নেবে। অথবা শ্রীগুরুর মুখে একটি নাম শুনে নেবে। বাস্ আর কোনো কথা নেই। নিশ্চিন্ত হয়ে নির্ভয়ে নামটি তুমি জপ ক'রে যাও। জপ, জপ আর জপ। ক'রে যাও, ক'রে যাও, ক'রে যাও। জপ করতে তোমার অসুবিধা কি। ভগবানকে তুমি ভালবাস তো। ভগবানের নাম করতে তোমার আনন্দ হয় তো। অত্যন্ত প্রিয় যে ব্যক্তি তাঁর নাম ধ'রে ডাকবে—এতে তো কোনোই ব্যাপার নেই।

তিনি তো রয়েছেন। আর তাঁর খেয়াল তোমার প্রতি নিশ্চয় আছে। কোনো কারণেই স'রে যায়নি। তিনি তোমাকে খেয়াল করেছেন ব'লেই তো তুমি বেঁচে রয়েছ। তিনি জানেন ব'লেই তুমি রয়েছ তোমার জ্ঞানে এবং মনের ভাবে।

আগে তিনি, পরে তুমি। এ একেবারে সত্যি কথা। তিনি জাগ্রত, জীবন্ত একটি সত্তা। সেই সত্তা রয়েছে তোমার পিছনে। যাকে বলে basic সত্তা। মৌলিক সত্তা এ কথাও বলতে পার। অর্থাৎ কিনা মূলগত সত্তা। সেই সত্তার উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এই সমগ্র বিশ্বখানা। সে আছে, তাই আছে। সে আছে, তাই আছি। সে আছে তাই সকলেই আছে।

কোনো দিকে কোনো অসুবিধা নেই। শুধু দৃষ্টিটা গিয়ে পড়ুক সেই সমগ্রতার দিকে। সকল নিয়ে যিনি তাঁর কথাই বলছি। সকল নিয়ে যে তাঁর কথাই বলছি। এই বিশ্বমাঝে যা কিছু সমস্ত হয়ে যে বা যিনি

বিরাজমান তাঁর কথাই আমি বলতে বসেছি। আর কার কথা কি বলব। সকল নিয়ে যিনি ওই রয়েছেন তিনি। সকল নিয়ে যে, এই রয়েছে সে।

আমি সেই একজনের কথাই ব'লে যাই। আমি সেই একজনের কথাই বলতে এসেছি। কত ছাঁদে বলব, কত রকমে বলব তা বলতে পারি না। শুধু ব'লে যাই, আর ব'লে যাই। ব'লে ব'লে আমার যেন সাধ আর মেটে না।

সেই একজনকে ঈশ্বর বলব, কি ভগবান বলব, কি অন্য কিছু বলব সেই দিকে বেশী মন দিতে পারব না।

মন আমি তাঁকেই দোবো। মন আমি কি তাঁকেই দেব? দিয়েছি কি না জানি না, তবে তাঁকেই দেব এটাই ঠিক। এইটিই আমার সংকল্প।

আমার মনের গভীরে তাঁকে কিছু একটা দিতে চাই। আমার আমাকেই আমি তাঁর কাছে রাখতে চাই। বারে বারে তাঁর পায়ের কাছে দিয়ে আমি আমার জীবনের সত্যিকারের মূল্যায়ন করব। দেওয়ার এই অর্থ যে, আমি ঠিক চিনে নেব কোন্ জিনিস কোথাকার অথবা কোন্ জিনিসটা কি।

এই হ'ল আমার সংকল্প। আমার অন্য যত সংকল্প সকল সংকল্প এই সংকল্পেরই ডালপালা, আর কিছু নয়।

আমার জীবনখানাই তোমার হয়ে পড়বে। প্রথমে হবে তাঁর, তারপরে হবে তোমার। আমার আমিটাই যে নিতান্তই তোমার ছাড়া কিছু নয়। সেটা তো একেবারে সত্যিকথা।

আগে তুমি, তারপরে আমি। তুমি রয়েছ এবং হয়েছ। আমিও রয়েছি এবং হয়েছি।

পরিচ্ছেদ—৪২

এবারে একটা গল্প বলতে বসেছি কিন্তু। গল্প মানে কাহিনী। সেই কোন্ যুগের কাহিনী। আমার জীবনের পুরোনো দিনের কোনো এক অধ্যায়ের কয়েকটা পৃষ্ঠায় ফিরে যাই এখন।

সেই একবার কলকাতার নিকটবর্তী শিবপুরে গিয়েছিলাম আমি। সঙ্গে ছিল জনা কয়েক। তার মধ্যে সুধীরবাবুর কন্যা জলি এবং ডলি ছিল অবশ্য। তখনকার দিনে সুধীরবাবুর সঙ্গে ছিল আমার বেশী রকমের যোগাযোগ। সুধীর গুহ মশাই আমাকে অত্যন্ত রকমের স্নেহ করতেন। সুধীরবাবুর স্ত্রী আমার খুব কাছের লোক ছিলেন।

বীণাপাণি গুহকে আমি ডাকতাম মাধবের মা ব'লে। প্রথমে ওঁদের সঙ্গে পরিচয় দক্ষিণ কলিকাতায়। কি একটা রাস্তায় ওঁদের বাড়ী। রাস্তা যাই হোক, আমি ওঁদের সেই বাড়ীতে গিয়েছি বার বার কতবার। ওঁদের দুই কন্যা জলি এবং ডলি আমার কাছে আসত। আমি এবং আমার স্ত্রী যমুনা তখন থাকতাম বালিগঞ্জ গার্ডেন্‌সে। তারপরে ঘুরেফিরে চ'লে গেলাম ১৪/১, সেণ্ট্রাল পার্কে—মহেন্দ্র বাবার বাড়ী। সেখানেও ওঁরা অনেকবার গিয়েছে। সেখানেও আমি অনেকদিন ছিলাম। মানে কয়েক বৎসর।

তারপরে মাঝখানে অল্পকিছু কালের জন্য গিয়েছিলাম ছোট্ট একটা আস্তানায়, যাদবপুর টি. বি. হাসপাতালের সন্নিকটে। কয়েকমাস বাদে আবার চ'লে গেলাম মহেন্দ্রবাবুর বাড়ীতেই। সেখানে কেটে গেল আমার জীবনের আরও কয়েকটা বৎসর। এইভাবে মহেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে দু খেপে কাটল আমার দিনের পরে দিন, অনেকগুলো দিন। সব শুদ্ধ বেশ কয়েকটা বছর।

মহেন্দ্রবাবু যে আমাকে কি চোখে দেখতেন অথবা কি ভাল যে বাসতেন সে কথা ভাষায় কেমন ভাবে বলব। শেষকালে অথবা তাঁর শেষ জীবনে তাঁর আচার ব্যবহারের মধ্য দিয়ে অথবা তাঁর জীবন যাপনে এই কথাটা

প্রকাশ পেয়েছে অতি উজ্জ্বল আকারে।

এইভাবে হু খেপে আমি মহেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে অনেকগুলো বছর কাটিয়ে দিলুম। প্রজ্ঞা-পারমিতা অর্থাৎ কিনা আমাদের পুষ্প ছিল ছেলে-মানুষ। ক্রমেই বড় হয়ে উঠছে।

আশ্চর্য ওর জীবন-কথা। আমি বলব, ও ঈশ্বরের দ্বারা নির্দিষ্ট একটি বিশেষ রকমের মানুষ। এতে কোনো সন্দেহ নেই।

পরিচ্ছেদ — ৪৩

এ জগৎ চ'লে যায় তাই জগৎ। স'রে স'রে যায় তাই তো সংসার। আমি বলব নিত্যি নতুন হয়ে ওঠে। নিত্যি নতুন, নিত্যি নতুন। এককালে আমি মনের আনন্দে একটি কবিতা আওড়াতুম। নিত্যি নতুন ফুলের বনে বিষ্টি দিয়ে যায়। এই লাইনটি কোথায় যে পেলুম তা ঠিক জানি না। কিন্তু আপন মনে আওড়াতুম। আমার জীবনের একটা সময় কবিতার এই লাইনটি আমাকে যেন পেয়ে বসেছিল। আমি তখন দেরাদুনে। অনেক পরের যুগের কথা কিন্তু।

মা আনন্দময়ী আমাকে তখন ছোঁ মেরে নিয়ে গেছেন একটি চিলের মত। আমার কোনো কথা নেই। বিপত্তিও নেই, আপত্তিও নেই। আমি ছিলাম কলকাতাতে। ঘুরতে ঘুরতে এসে গেলাম দেরাদুনে।

মায়েরি কারসাজি। আমি বলব, আমার সেই মায়েরি নতুন নতুন কারসাজি। আনন্দময়ী মা আমাকে নিয়ে গেলেন কি আর একজন আমায় নিয়ে গেলেন—সে কথা চিন্তা ক'রে আমার কিছু লাভ নেই। এমন কি বলতে গেলে, অবান্তর সে চিন্তা। নিতান্তই অবান্তর।

কথাটা এই, একজন আমাকে ঘোরাচ্ছে, আমি ঘুরছি। ঘুরতে

ঘুরতে পর্যায়ের পর পর্যায় অতিক্রম করছি।

যে সময়কার কথা বলছি, সেই সময়টাতে আমি দেরাদুনে। আমার মধ্যে তখন কি রকম এক সঙ্গে দুটো ভাবই খেলত। একদিকে আমি চলতি মানুষ। আব একদিকে আমি অন্য একটা জগতের মানুষ। তখন আর আমি চলতি পয়সা নই। বিশ্ব সংসারে থেকেও আমি চ'লে গিয়েছিলুম যেন বিশ্বসংসারের বাইরে।

সকলের মধ্যেই বাস করতুম। অথচ আমি আছি সকলের বাইরে। বিশ্বের বাইরে ঠিক নয়। তবে অন্য এক বিশ্বে বটে।

তাপসদির কথা বলছিলুম। তাপসদি আমার জীবনে এসে পড়েছিল —আশ্চর্য এক মহিলা। আমি তখন আলমোড়াতে। মায়ের সঙ্গে সঙ্গে।

তাপসদি ছিলেন গৈরিকধারিণী। রামকৃষ্ণ মিশনে দীক্ষিত। শিবানন্দজী অর্থাৎ মহাপুরুষ মহারাজের কাছে তিনি দীক্ষা নিয়েছিলেন। তারপরে তিনি অন্যদিকে, অন্যপথে। তাপসদির কথা এত ক'রে বলছি কেন তার কারণ আছে। তিনি নিজেও এক অসাধারণ মহিলা ছিলেন। আমার কাছেও এসে পড়েছিলেন অনেকখানি।

আমি তো কিছুই না। এবং কিছুই না ব'লেই অনেক কিছু দেখবার এবং বোঝবার অবসব আমার হয়েছিল বটে।

কেন জানিনা তাপসদি আমাকে অত্যন্ত রকমের স্নেহের চোখে দেখতেন। স্নেহ বল স্নেহ, ভালবাসা বল ভালবাসা, যা বল তাই। সেই আলমোড়াতে। তারপরে অনেকদিন ধ'রে তাপসদির সঙ্গে আমার যোগাযোগ। তারপরে শেষে কি একটা দারুণ দুর্দান্ত কঠিন রোগ তাঁকে ছিনিয়ে নিয়ে চ'লে গেল আমাদের কাছ থেকে।

বলেছি, তাপসদির গল্প শুরু আলমোড়াতে। বিচিত্রবিহারী এক পাখি ছিলেন তিনি। আমার সঙ্গে প্রথম দেখা আলমোড়াতেই। সেইখানে কিছুকাল আমার কেটে গিয়েছিল। ব্যবহারিক ভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, আমি তখন এক সাধু।

আশ্রমের নীচে পাহাড়ের গা থেকে ঝর্‌ঝর্‌ ক'রে জল পড়ত। সেই খানটাকে বাধিয়ে টাধিয়ে ঠিকঠাক ক'রে নেওয়া হয়েছিল। পাহাড়ের গায়ের থেকে ঝর্‌ঝর্‌ ক'রে ঝ'রে পড়ছে জল অবিশ্রান্ত ধারায়—কয়েকটি ধারায়।

আমার তখন বলতে গেলে ছেলেমানুষ বয়েস। কত আর হবে ২২/২৪ হ'তে পারে।

এইখানটায় আমরা স্নান করতুম। খুব একটা আমোদ হ'ত। অনেক সময়ে আমি কৌপীন প'রেই স্নান করতুম।

ওখান থেকে অনেকটা নীচে নেমে গেছে একটি ছোট্ট জলাশয়। পাহাড়িয়া ধরনের। চারিদিকেই পাহাড়। শুধু পাহাড় আর পাহাড়।

আমার কাছে সেই মেয়েটি - যার নাম তাপস দেবী কী যে পেয়েছিলেন তা আমি জানি না। আমাব কাছে এসে মেয়েটি এ গল্প, সে গল্প, নানান গল্প করত।

মেয়েটি আর কেউ নয়, আমাদের তাপসদি। রাত্রিতে তিনি কোথায় থাকতেন তা বলতে পারি না। থাকতেন সম্ভবত আমাদেরই কোনো একটা গুহায অথবা সংলগ্ন কোনো একটি বাসস্থানে।

আমাদের তাপসদি। আমার স্বভাবের কথা ব'লে রাখি। কোথায় আছি, কাব কাছে আছি, সেখানে আমার কি কর্তব্য সেইসব কথা আমার মাথায় বেশী স্থান পেতনা। ওসব কোনো কথা আমি চিন্তাই করতুম না প্রায়।

আমি যেন ভেসে চলেছি। কোথার থেকে কোথায় কে জানে। এখন আলমোড়াতে আছি এই পর্যন্ত।

আমার সঙ্গে থাকত একটি ষ্টিলের বড় বাক্স। মোটা চাদরের বাক্স। যেখানে যেতুম সেখানেই বাক্স ঘুরত। যতদূর মনে হয় আলমোড়াতেও হয়তো বাক্সটা ছিল। এখনো রয়েছে সে বাক্স। তবে মনে হয় এখনকার দিনে এই রকম চাদরের বাক্স সহজে দেখতে পাওয়া যায় না। আর

আমার মনে পড়ছে সেই সময়ে আলমোড়াতে সেই বাক্সটা আমার সঙ্গে ছিল।

সে যা হোক, আলমোড়াতে আমরা সব থাকতুম দু তিনটে জায়গাতে। আবার আসি তাপসদির কথায়। কত কথাই তাপসদির সঙ্গে হ'ত আমার। তাপসদির হাতের লেখা ছিল চমৎকার। যতদূর মনে পড়ে তাপসদিই আগ বাড়িয়ে আমার কাছে এসে আলাপ করত। আগে এই গ্রন্থে কোথাও তাপসদির প্রসঙ্গ বেশী এনেছি কি না মনে নেই। তাপসদি ছিলেন বিদুষী-এ কথা স্বচ্ছন্দে বলা যেতে পারে। হাতের লেখা চমৎকার, লেখার ধরনও চমৎকার। তবে চেহারা তার এমন কিছু আহা মরি নয়। মোটামুটি। তবে চোখে মুখে বিদ্যা এবং চিন্তার ছাপ ছিল তো বটেই। সে পরবর্তী যুগে সাধক এবং চিন্তক প্রসিদ্ধ কৃষ্ণমূর্তির কাছে গিয়ে পড়েছিল। তখন থেকে সে কৃষ্ণমূর্তিরই একান্ত আত্মীয় হয়ে ওঠে। এ সব কিন্তু আলমোড়া প্রসঙ্গের অনেক পরের কথা। তাপসদি আমাকে ভালবাসত ব'লেই কৃষ্ণমূর্তির ব্যাপারটা আমার গোচরে এনেছিল। কৃষ্ণমূর্তিজীর অন্তরস্থ গুণরাশি সে দেখতে পেয়েছিল। তাইতো আমাকেও টেনেছিল সে দিকে।

যে ভাল সে অনেক স্থানেতেই ভাল। প্রায় জায়গাতেই ভাল। তাপসদি ছিলেন ঠিক তাঁরই মত। সর্বদাই সবখানেতেই দেখতে পেয়েছি তাঁর একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠত। সেই বৈশিষ্ট্য যেন নিজের সৌন্দর্যে নিজে ঝক্‌মক্ করত।

বলেছি এবং বলছি, তাপসদি থাকতেন তাঁর নিজ মহিমায় উজ্জ্বল। পরবর্তীকালে কোনো এক সময়ে তাঁকে দেখতে পেতাম প্রসিদ্ধ একজন মনস্বীর আওতার মধ্যে। তিনি শ্রীঅরবিন্দের Life Divine অনুবাদ ক'রে সুবিখ্যাত। বইয়ের নাম দিয়েছিলেন দিব্য জীবন। শেষের দিকে তিনি থাকতেন দক্ষিণ কলকাতায় একটা অঞ্চলে।

এসব কথা আমার মনে হয় খুবই সুন্দর, খুবই চমৎকার। দিব্য জীবন

যে পড়বে অথবা Life Divine যে পড়বে সে নিশ্চয় চির সুন্দরের গহন রহস্যে ডুব দিয়ে তলিয়ে যাবে। আমার এ রকম ধারণা।

তবে আমি ব'লে থাকি, বর্তমানে আমার ক্ষীণ কণ্ঠে আমি এ কথাই বলছি—এগিয়ে চলো, আরও এগিয়ে, আরও আরও তলায় তলিয়ে যাও। ভিতরে, দূরে সুদূরে—কে জানে কোথায় কোনখানে। সেই তাঁর সঙ্গে দেখা হবে কি হবে না তাও বলা যায় না। দেখা হোক বা না হোক—কি যেন থাকবে। কে যেন অপেক্ষা করছে। সবকিছু শেষ হয়ে গেলেও সেই একজনের অপেক্ষা আর অপেক্ষা। সেখানে উপেক্ষা নেই। একজনের জন্য চিরন্তন অপেক্ষা।

প্রথম তাপসদির সঙ্গে দেখা এবং কিছুকাল কাটানো সেই আলমোড়াতেই। তাপসদির বয়স তখন ৩৫ মতন হবে। পরনে গৈরিক বস্ত্র। রামকৃষ্ণ মিশনের মহাপুরুষ মহারাজের কাছে দীক্ষিত সে তো আগেই বলেছি। পড়াশুনো বেশ করেছেন এবং করেন—এই কথাই আমার মনে পড়ে। পড়াশুনোর দিকে বিশেষ যেন খেয়াল। তখন তো আমার প্রথম আলাপ। আর আমিও ছেলেমানুষ। আমার বয়স ওঁর বয়েসের থেকে অনেক ছোট। হয়তো ১০/১১ বছরের ফারাক হবে।

কখনো কখনো গল্প জুড়ে দিত। ওঁর গল্পে আমিও যোগ দিতাম। বাস্ এই পর্যন্ত। তবে একদিন ঘটল একটি ঘটনা। ঘটনাটা এই, কথা কইতে কইতে ও আমাকে সহসা ওঁর বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরল। সেও ক্ষণের তরে। ব্যাস্ আর কিছুই নয়। এই একটি ঘটনা ছাড়া তাপসদির কাছ থেকে ওই জাতীয় কিছু ব্যবহার আমি কখনও পাইনি।

অনেক সময় রাত্রিতে ওঁর কাছে গিয়ে বসতুম। ছোট্ট ছোট্ট ঘর। আমার ঘর আর ওঁর ঘর খুবই কাছাকাছি। আবছা আলোতে অথবা অন্ধকারে ব'সে যা কিছু কথাবার্তা হ'ত। আমার বেশী কিছু মনে পড়ে না। কেবল এটুকু পরিষ্কার মনে আছে চারিদিকে পাহাড় আর পাহাড়। লোকজন কোথাও কিছু নেই। আমাদের ওই অঞ্চলটাতেও কোথাও কেউ

থাকত না। উপরে অনেক উঁচুতে দেখা যাচ্ছে আনন্দময়ী মায়ের আশ্রমটি এই পর্যন্ত। সেখানে যাওয়া কিংবা আসা খুব একটা সহজ কর্ম নয়। আমি তো আগেই বলেছি চারিদিকে শুধু পাহাড় আর পাহাড়। যা ঘটেছিল সেটুকু শুধু এটুকু। আর কিছুই না।

এইটুকু বলতে পারি, কাজে কর্মে আচারে ব্যবহারে তাপসদি ছিলেন perfect gentleman. সুন্দর চেহারা না হ'লেও সুন্দর কথাবার্তা, সুরুচি-সম্পন্ন আচার ব্যবহার, চমৎকার চাল চলন। কোথাও কিচ্ছু না। আমার একটা ধরন ছিল আমার জীবনে যা ঘটবে সব আনন্দময়ী মাকে বলা চাই। আনন্দময়ী মাকে আমি মনে করতুম সাক্ষাৎ দেবতা। হয়তো সাক্ষাৎ ভগবান, তার চেয়ে কম কিছু না। এটা না বললে ভুল বলা হবে, আনন্দময়ী মা আমাকে অত্যন্ত বেশী বিশ্বাস করতেন।

সে যা হোক, আমি আমার ধরনে মায়ের কাছে গিয়ে সমস্ত কথা বললুম এই এই ঘটনা। আনন্দময়ী মা সচকিত হয়ে উঠলেন। আমি ওঁর কাছে এসেছি, ওঁরই কাছে আছি, সেইরকম ভাবেই জীবন যাপন করছি। এতদূর পর্যন্ত ঠিক আছে বাস্। এখন থেকে সাবধান। অন্য রকম কিছু যেন না ঘটে। একেবারেই না ঘটে। এ রকম একটা আঁচ পেলাম মায়ের কাছ থেকে যেন।

একদিন তো মনেই আছে। উপরে আশ্রমেতে মায়ের সঙ্গে তাপসদির হ'ল কিছু উত্তপ্ত কথাবার্তা।

সম্ভবত মায়ের এরকম ভাব ছিল তখন, আমার অভয় যেন আর কারও না হয়ে যায়। এমনও হ'তে পারে মা তার ছেলেকে রক্ষা করার জন্যই বুঝি এইরকমের আয়োজন করেছেন। মা কি জন্য কি করছেন, সে কথা মা নিজেই ভাল জানেন।

সে যা হোক, ঘটনাটা বেশীদূর গড়িয়ে গেল না। কয়েকদিন অথবা কিছুদিন বাদেই তাপসদি কোথায় যেন চ'লে গেলেন। কি যেন কি ঘ'টে গেল একটা। সেই সময়টাতে শুধু মনে পড়ছে একবার আলমোড়া

আসা কালে কারা যেন তাপসদিকে পুরুষ মানুষ মনে করেছিল। তাপসদি বোধহয় দু একটা চড় চাপড়ও খেয়েছিলেন। গাড়ীর মধ্যে অর্থাৎ কি না রেলগাড়ীতে জায়গা নিয়ে অথবা ওই রকম একটা কিছু ব্যাপার নিয়ে হয়েছিল হ্যাঙ্গামো।

এটুকু স্বীকার করতে আমার কিছুমাত্র বাধা নেই, তাপসদি আচারে ব্যবহারে এবং অন্যান্য দিক থেকে বড়ই ভদ্র ছিলেন। এইটুকু না স্বীকার করলে তাঁর উপরে অবিচার করা হবে। তাপসদির কথা চলেছে, তাপসদির কথাটাই শেষ করি। দিন চ'লে গেল, মাস চ'লে গেল, হয়তো বা বছরও চ'লে গেল, একের পরে এক।

তাপসদি আমার সঙ্গে যোগসূত্র ঠিক রেখেছেন। একটু অন্য রকম হয়েছে। কিছু ব্যতিক্রম। একটা পট পরিবর্তন।

তাপসদি হয়ে গেলেন প্রসিদ্ধ মহাপুরুষ নিগমানন্দজীর শিষ্য অনির্বাণ-জীর পন্থাবলম্বী। কিছুই আশ্চর্য নয়।

তাপসদি তাঁর নিজ ধারায় নিজ মহিমায় বর্তমান অথবা বিরাজমান। আমি যতটা জানি তাপসদি তাঁর নিজ পথ হারিয়ে অথবা ছাড়িয়ে কোনো-দিকেই এক চুলও স'রে যাননি। প্রথম দিকে অর্থাৎ তাঁর জীবনের প্রথম বিভাগে কোন্ সময়ে কোন্ কালে তিনি রামকৃষ্ণ মিশনে দীক্ষা নিয়েছিলেন সেসব কাহিনী তাঁর নিজ মুখ থেকেই শুনেছি। তিনি বলেছিলেন ব'লেই জানতে পেরেছি। তাঁর জীবনে কত কিছুই ঘ'টে গেছে। ঘটন অঘটন সমস্তই ঘটেছে একের পরে এক। বৈচিত্র্য এবং বৈচিত্র্য এই উভয় রকমই এসেছে। সাম্য এবং বৈষম্য এই দুরকমের —কোনোটাই বাদ যায় নি।

মোটের উপর কথা এই, আমি তাপসদির মত প্রবল চরিত্রের আর একটি দৃষ্টান্ত খুঁজে পাইনি। কথা কম বলতেন। খুবই কম বলতেন। আমিও তাপসদির সঙ্গে বহুল পরিমাণে মেলামেশা করেছি। বাইরের দিকের প্রমাণ এই, তাঁর সুন্দর হাতের লেখাতে চমৎকার

কিছু সংখ্যক চিঠি আমার কাছে এসেছিল। একখানি চিঠি বোধহয় এখনও আমার কাছে রয়েছে। আর, না থাকলে নেই। তাপসদির হাতের লেখা চিঠি একখানি সুদীর্ঘকাল আমি পুষে রেখেছিলুম। কিন্তু সংসারে সবই স'রে স'রে যায়। স'রে যায় ব'লেই তো সংসার। চ'লে যায় ব'লেই তো জগৎ।

তাপসদি আমার কাছ থেকে অনেক দূরে চ'লে গেছে। কোথায় চ'লে গেছে বলতে পারি না। কতদূরে—কোন্ সুদূরে।

একটি কথা মনে পড়ে, তাপসদি কখনও হাসতেন না অথবা খুব কমই হাসতেন। আর বলেছি, তাঁর চেহারার মধ্যে বাইরের দিকে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল না যার দ্বারা তাঁকে চিহ্নিত করা যায়। রঙ তো কালচে ছিল বটেই, মুখমণ্ডলের যে কোনো feature কোনোক্রমেই উল্লেখযোগ্য ছিল না। তবু কী একটা ছিল যার জন্য তাপসদিকে আমি স্বচ্ছন্দে ফেলতে পারি অনেকের মধ্যে একের কোঠায়।

তাঁর মৃত্যুর কথাটা এখানে একটু উল্লেখ না ক'রে পেরে উঠছি না। তাঁর যেমন ধরন তেমন মরণ। আমার কাছাকাছি অনেকগুলো দিন কাটিয়েছেন একথা সত্যি। বাইরের দিকে তেমন নয় একথাও সত্যি। তাঁর মুখমণ্ডলে এমন কিছুই ছিল না যা striking—একথা আমি পূর্বেও বলেছি। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে যাই, এমনতরো সাদামাটা একটি ব্যক্তি এক পাশ দিয়ে এসে আমার এই বিচিত্র জীবনের ভিতরে একটি বড় রকমের আসন দখল ক'রে নিল—কেমন ক'রে তাই ভাবি।

তাপসদির মরণের কথা বলছিলুম। শেষ জীবনে যেখানটাতে থাকতেন সেখানকার লোক এসে আমার কাছে বলেছিল, তাপসদির দেহান্ত হয়েছে। দেহান্ত হয়েছে তো হয়েছে। না, ঠিক তেমনটাতো নয়। দেহান্ততো অনেকেরই হয়। দেহান্তও হয় প্রাণান্তও হয়। আর জীবনান্তও। সবই হয়। সবই হয়েছে। তবু কে যেন আমার কাছে একটুখানি ছাপ ফেলে

গেছে।

সে ছিল নীরব, নিস্তব্ধ, শব্দহীন। শব্দ প্রায় না থাকার মত। গৈরিক ধারণ করেছিলেন অনেকদিন। আবার তার পরের দিকে সেই গৈরিক বোধকরি ফেলেও দিয়েছিলেন। এতবার ধরাই বা কেন, এতবার ফেলাই বা কেন। শুধু গৈরিক নয়—আরও কিছু কিছু।

এখন আমি ভাবি, তাপসদি যা করেছিলেন ঠিকই করেছিলেন। অনেক সময় অনেক মানুষ অনেক কিছু ধরে এবং ছেড়ে দেয়। গ্রহণ করে আবার ত্যাগ করে। আমার কাছে এখন মনে হয় সবটাই সুন্দর, সমস্তটাই সুন্দর। কুচ্ছিৎ কিছুই নেই—হতকুচ্ছিৎ তো দূরের কথা। বেখাপ্পা কিছুই ঠেকে না। গোল এবং মাল দুটো নিয়ে গোলমাল। কিন্তু দুটো নিয়েই সুন্দর। একটাকে বাদ দিলেই একপেশে হয়ে গেল।

একপেশে আমার কাছে কিছুই নেই। সকল পাশে শুধু একজন। সকল পাশে সেই একজনই। এদিক ওদিক সকল দিকে শুধু সেই তিনি যে-জন জন হয়েও জন নয়। দেবতা। দেবতা বললেও যেন ঠিক বলা হ'ল না। বললে বলতে হয় পরম দেবতা। অথবা বললে বলতে পারি দেবতা in the real sense of the term.

সেই দেবতাকে দেখতে পাচ্ছ না তুমি? আমি কিন্তু দেখতে পাচ্ছি। তুমি স্বচ্ছন্দে একথা ব'লে বেড়াতে পার, সেই দেবতার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকার হয়েছে।

তবে সাক্ষাৎকার হ'লেও আরও আছে। আরও, আরও, আরও, অনেক, অনেক, অনেকদূর পর্যন্ত। সেই তিনি আর সেই তিনি। সেই তুমি আর সেই তুমি। সেই আমি আর সেই আমি।

আমি, তুমি আর তিনিতে কী পার্থক্য? মূলগত পার্থক্য কই কোথাও কিছু চোখে পড়ছে না তো। পার্থক্য তো নেই কিছু, তা চোখে পড়বে কি ছাই।

ব্যাপার কিছুই নয়। অথচ সব কিছুই। এইখানেই তো মজা।

এইখানেই তো আনন্দ। এইখানেই তো কৌতুক। এইখানেই তো কাণ্ডকারখানা। এইখানেই তো সৌন্দর্য। যেটা বিচিত্র সেটা এইখানেই খুব বেশী বিচিত্র সেজেছেন।

বাস্। আমার কথাটাকে গুটিয়ে এইখানেই এখনকার মত শেষ করবার তালে আছি। তাল এবং সুর দুই দিক থেকেই শেষ ক'রে আনছি কিন্তু। এখনকার মত এই শেষ। এর পরে নতুন ক'রে কিছু নতুন কথা বলবার দিকে যাব। কিন্তু সব নতুন কথাই আমার জীবনের পুরোনো কথা। কথা প্রকৃতপক্ষে নতুনও নেই পুরোনোও নেই। কথা শুধু কথাই।

আবর্তন, বিবর্তন, পরিবর্তন—এই সমস্তই এসে যাচ্ছে অবশ্যই। যা আসছে আসুক। নিজেকে বলছি, যা এসে যাচ্ছে আসতে দাও। তারপরে স্রোত যেদিক পানে চলে চলুক।

শ্রীঅভয়জী রচিত পুস্তকাবলী

১। স্বভাব ৫ ০০
২। সত্য-সরণী ২ ০০
৩। সত্যের সংসার ২ ০০
৪। শুভ পথ ২ ০০
৫। কাজের কথা ২ ০০
৬। আশ্রয় ১ ০০
৭। ত্বমেব ১ ০০
৮। ফুল-পাতা ৪ ০০
৯। জাগৃহি ৫ ০০
১০। প্রাণের কথা ৪ ০০
১১। তুমি ডাক দিয়েছ ১০ ০০
১২। অভয়জী কী বাণী ৩ ০০
১৩। Words that Matter ৩ ০০
১৪। পথের গান (স্বরলিপি সহ) ১০ ০০
১৫। 'কীর্তন সভা'র পরিচয় ১ ০০
১৬। শ্রীঅভজীর বাণী ৪ ৫০
১৭। পত্রালি ৫ ০০
১৮। পত্রবাণী ১৪ ০০
১৯। তোমার কাছে প্রার্থনা ৫ ০০
২০। একটুখানি পরিচয় ৫ ০০
২১। দীক্ষার প্রসঙ্গে ৬ ০০
২২। হমারে অভয়জী ৩ ০০
২৩। আমার জীবন কথা কিছু ব'লে যাই (১ম খণ্ড) ২০ ০০

ব্রহ্ম-কর্ম-গ্রন্থমালা

১। তাঁহার পানেতে চাও ৩ ০০
২। আলোর ডাক ২ ০০
৩। আমাদের ভাবধারা ৩ ০০
৪। প্রয়াণ ৪ ০০
৫। ছোটোদের পুঁথি ৩ ০০

প্রজ্ঞা-পারমিতা দেবী রচিত—
একটি অন্তরের রূপান্তর ১ ০০

অনন্তা দেবী রচিত—
অবাক হয়ে যাই ৭ ০০

পুস্তকাবলীর প্রাপ্তিস্থান

কীর্তন কুটির
রিজেণ্ট এস্টেট
কলিকাতা ৯২

আরাধনা জগৎ
২২-সি, অজন্তা রোড
কলিকাতা-৭৫

আলোক তরণী
সীমান্ত পল্লী
শান্তিনিকেতন
বীরভূম

মহেশ লাইব্রেরী
২/১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২